ভাবমুখে

চৈত্র : অষ্টবিংশ বর্ষ : তেরশ' একাশি : শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম, সিউড়ী।

ভারতের মোটর পার্টস্ ব্যবসায়ের
একটি ঐতিহ্যপূর্ণ বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

হাওড়া মোটর কোম্পানী

= লিমিটেড =

রেজিস্টার্ড অফিস—১৩৫, শরৎ বোস রোড
ক লি কা তা-২৬

প্রধান বিক্রয় কেন্দ্র—১৩, রাজেন্দ্র নাথ মুখার্জি রোড
ক লি কা তা — ১

অন্যান্য শাখা—দিল্লী • পাটনা ধানবাদ কটক শিলিগুড়ি • গৌহাটী

●

Buy

ORPHAN'S TEA

for

Health & Economy

ORPHAN TEA SYNDICATE

133, Cornwallis St Shyambazar

Phone : 55-2704

যুগে যুগে যার আসা

স্বামী সত্যানন্দ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের ভাব জীবনের ও সাধনমার্গের এক অপূর্ব আলেখ্য এই গ্রন্থখানি। গ্রন্থটী শুধুমাত্র জীবন কাহিনী নয়, জীবন বর্ণনাচ্ছলে জীবন আলোচনা এবং ভাষ্য।

[২য় সংস্করণ, পরিবর্ধিত মূল্য—সাত টাকা।

"মানুষের মাঝে মানুষ রতন আছে"—শ্রীঠাকুর

D.RATAN & Co.
Photographers PHOTO
22-1, CORNWALLIS ST, CAL-6
PHONE : 34 - 3711

★

ডি.রতন এণ্ড কোং
ফটোগ্রাফার্স
ফোন ৩৪ - ৩৭২১
২২-১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলি-৬

চৈত্র
দ্বাদশ সংখ্যা

শ্রীশ্রীমা সারদা

অষ্টবিংশ বর্ষ
তেরশ' একাশি

গান	৪২৩	শ্রীশ্রীঠাকুর
অচেতনের চেতন	৪২৪	শ্রীঅর্চনাপুরী
গীতার বাণী	৪২৫	সাধনাপুরী
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মরণে	৪২৭	স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ
জন্মদিনে	৪২৮	শ্রীশরণাপুরী
রত্নরাজ হুমায়ুন	৪২৯	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত
শুনুন, শুনুন, গোপন কথা বলছি	৪৩২	শ্রীকিরণ সিংহ
পুনর্জন্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ	৪৩৫	অধ্যাপক প্রণবেন্দু প্রসাদ পাল
বেদ ও অবেস্তা	৪৩৮	পূরবী পাল, এম, এ, পি-এইচ, ডি,
প্রাথমিক শিক্ষা রাজ্যে রাজ্যে	৪৪০	সুদর্শন বিশ্বাস এম, এ, বি, টি,
স্বামী শিবানন্দ	৪৪২	স্বামী হীরানন্দ
আমাদের ঠাকুরের জন্মোৎসব	৪৪৪	স্বামী মৃগানন্দ
একটী জীবন একটি সমাধি	৪৪৯	শ্রীনীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত
প্রণাম তাঁহার পদ্মপদে	৪৫১	শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক
World Psychology	75	Sreemat Swami Satyananda Deva
Spiritual Talks	77	From R. L. Goel's Diary
Ful Jhare Jaye Tabu Gaan Jhare Naa —Sree Thakur		Translated by S. N. Sanyal
Whither our Students : Wherein the Remedy	61	Principal K. C. Karmakar
Swami Abhedananda Speaks	62	K. Ghosh, B. L.

• আশ্রম পর্ব্ব পঞ্জী : বৈশাখ, ১৩৮৮

১৫ই	এপ্রিল,	১লা বৈশাখ,	মঙ্গলবার—সকাল ৮টায় নববর্ষের হোম
১৮ই		৪ঠা	শুক্রবার—শ্রীশ্রীসারদা বাসন্তী পূজা।
১৯শে		৫ই	শনিবার—শ্রীশ্রীসারদা অন্নপূর্ণা পূজা।
২২শে		৮ই	মঙ্গলবার—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম
২৫শে		১১ই	শুক্রবার—পূর্ণিমার হোম।
৭ই	মে	২৩শে	বুধবার—একাদশীর উপবাস ও রাত্রে হোম।
৯ই		২৫শে	শুক্রবার—শ্রীরামকৃষ্ণ বিদ্যাপীঠে বিশ্বকবির জন্মোৎসব পালন।
১১ই		২৭শে	রবিবার—অমাবস্যার হোম।
১৫ই		৩০শে	বুধবার—অক্ষয় তৃতীয়া।

• বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে।

GRAM DISWASHING

PHONE : Office : 24-1236
Works: 55-1738

PELICAN ENGINEERS

FABRICATORS OF STAINLESS STEEL CHEMICAL PLANTS,
PHARMACEUTICAL & FRUIT PRESERVATION EQUIPMENTS.

4, Hartford Lane, Calcutta-16
Works 161, UPPER CHITPUR ROAD
Calcutta-5

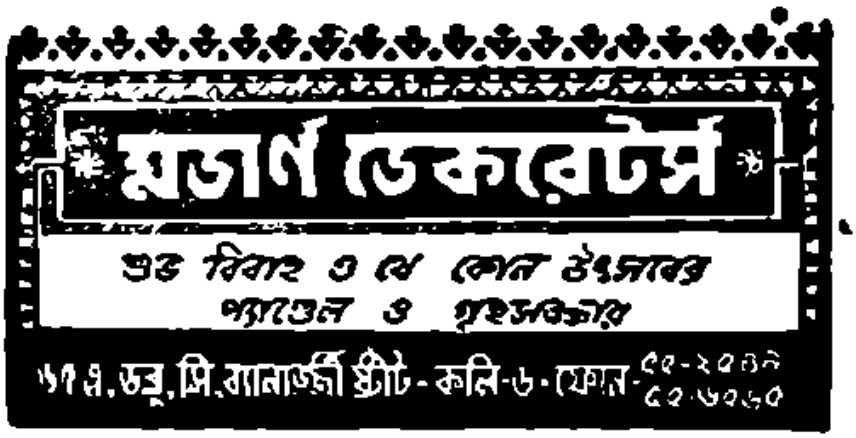

ভক্তগণের বহুদিনের প্রতীক্ষিত ও আকাঙ্ক্ষিত সদ্য প্রকাশিত

শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দদেবের জীবনী গ্রন্থ

করুণাবতার

শ্রীশরণাপুরী মূল্য : ১১·০০

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তন, ২, পি. কে. সাহা লেন, কলি—৩৬

কৃষি বিপ্লবের ঋত্বিক চাষীভাইদের শ্রদ্ধা জানাই

কৃষি লক্ষ্মী এজেন্সী

পোঃ আরামবাগ, জেলা হুগলী
(আরামবাগ বি. ডি. ও. অফিসের নিকট)
ফোন নং : আরামবাগ ১৪০

রামপুর, জেলা বাঁকুড়া।
ফোন নং : বাঁকুড়া ৫৩৪

ভোল্টাস লিমিটেড কোম্পানীর সরকার অনুমোদিত ভোটা ইলেক্‌ট্রিক পাম্প সেট, ইণ্টারন্যাশনাল ট্রাক্টর, পাওয়ার স্প্রেয়ার স্প্রিংলার এ্যালুমিনিয়াম পাইপ কামারলরী এণ্ড কোং লিঃ মার্কেটিং ডিভিশন-এর কৃষি ডিজেল পাম্প সেট, জে. কে. সাতো পাওয়ারটিলার বিক্রয়ের হুগলী ও বাঁকুড়া জেলার একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান।

রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও ব্লক অফিসের মাধ্যমে এক বছরের গ্যারান্টি সহ পাম্প সেট ও স্যালো টিউবওয়েলের সরঞ্জামাদি ও কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়।

'ভাবমুখের নিয়মাবলী'

'ভাবমুখে' সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমের মুখপত্র

বর্ষারম্ভ বৈশাখ মাস। বর্ষের যে কোন সময়ে গ্রাহক হওয়া যায়, কিন্তু কমপক্ষে ৬ মাসের গ্রাহক হইলে সুবিধাজনক হয়। বার্ষিক মূল্য সডাক টাঃ ৮·০০ পঃ। ষাণ্মাসিক টাঃ ৪·০০ পঃ।

রচনা : ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, ভ্রমণ, শিক্ষা, সংস্কৃতি ও শিল্প বিষয়ক প্রবন্ধাদি প্রকাশ হইয়া থাকে।

প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাইতে হইলে উপযুক্ত ডাকটিকিট পাঠান প্রয়োজন।

ছয়মাস পরে অমনোনীত প্রবন্ধাদি নষ্ট করিয়া ফেলা হয়।

কোন রচনা প্রকাশ করা সম্পূর্ণরূপে সম্পাদকের অভিমত সাপেক্ষ। সমালোচনার প্রয়োজন হইলে দুই কপি করিয়া পুস্তক প্রেরণ করা আবশ্যক।

বিজ্ঞাপন : বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু পূর্বমাসের মধ্যে পাঠাইলে উহা পরবর্তী মাসে প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনের হার পত্রযোগে জানিতে পারিবেন।

বিঃ দ্রঃ গ্রাহক গ্রাহিকাগণের প্রতি নিবেদন এই যে, পত্রিকা উপযুক্ত সময়ে না পাইলে সর্বপ্রথম স্থানীয় ডাকঘরে সন্ধান লইবেন এবং পরে অফিসে জানাইবেন। পত্রাদি লিখিবার সময় গ্রাহক সংখ্যা উল্লেখ করিবেন।

বার্ষিক চাঁদা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যে মণিঅর্ডার যোগে নাম ও ঠিকানা মণিঅর্ডার কুপনে পরিষ্কার করিয়া লিখিয়া 'ভাবমুখে' কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিবেন।

কোন গ্রাহক-গ্রাহিকা ঠিকানা পরিবর্তন করিলে উহা পূর্ববর্তী মাসের ৫ তারিখের মধ্যে কার্য্যালয়ে জানান আবশ্যক। পত্রিকা সচিব 'ভাবমুখে' কার্য্যালয় ; ২, পি. কে. সাহা লেন, কলিকাতা-৩৬। ফোন : ৫৬-২১৭০

শাল, আলোয়ান, সোয়েটার, সকল রকম শীতের পোষাক, বেনারসী, সিল্ক, তাঁতবস্ত্র, মিলবস্ত্র, সর্ব্বপ্রকার তৈয়ারী পোষাক, হোসিয়ারী ও আধুনিক ডিজাইনের ডেকরণ, টেরিলিন, টুইল ও ওয়াস্ এণ্ড ওয়ার শাড়ী বিক্রেতা।

রামকানাই যামিনীরঞ্জন পাল প্রাঃ লিঃ

বড়বাজার, কলকাতা—৭

ফোন : ৩৩-২৩০৩

Electrical Motor, Double Ended Grinder, Polishing & Buffing, Flexible Shaft Grinder Etc.

MANUFACTURED BY

RAMKANAI ELECTRO WORKS

26/2, PRIYANATH MIDDYA ROAD, BELGHARIA.
CALCUTTA-56

Phone : 61-1715

ফোন : ৩৪-১৯৫৩

এন্, কে, স্পোর্টস্

৬৭এ, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

●

যাবতীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম এবং কাপ শীল্ড ইত্যাদি বিক্রেতা বিভিন্ন ক্রীড়ামোদী কর্তৃক উচ্চ প্রশংসিত ও নির্ভরশীল প্রতিষ্ঠান।

●

শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রম পরিচালিত বিদ্যাপীঠ সমূহের যাবতীয় প্রয়োজনীয় খেলাধুলার সরঞ্জাম আমরা সরবরাহ করিয়া থাকি।

শ্রীরামকৃষ্ণপদ ভরসা

৺বামাপদ ঘোষ প্রতিষ্ঠিত

নরিকেলডাঙা রোলার ফ্লাওয়ার মিলস্

১৭/৪, কেনেল ওয়েষ্ট রোড, কলিকাতা-৯

স্থাপিত ইং ১৮৮৮ সাল

—•:•—

৮৬ বৎসরের

জাতীয় প্রতিষ্ঠান

ফোন : { ৩৫-৪১২৪ / ৩৫-৪১২৫

॥ স্বত্বাধিকারী ॥

রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এ্যাণ্ড ব্রাদার্স

N. G. CHAKRABARTI & CO.

Manufacturers of :

Alloy Steel Castings

SUCH AS

NICKEL CHROME STEELS
HEAT RESISTING STEELS
STAINLESS STEELS
AUSTENITIC MANGANESE STEELS
MADE IN
INDUCTION FURNACE

FINEST GREY IRON CASTINGS
HEAT RESISTING ALLOY IRON
HIGH DUTY IRON
THIN WALLED CASTINGS
GRADED IRON CASTINGS
OF
ALL SPECIAL GRADES & SIZES

●

QUALITY GUARANTEED

Works :
K-65, Howrah Industrial Estate,
P. O. Balitikuri
Howrah. (*West Bengal*)
Telephone : 66-4843

Head Office :
N. G. Chakrabarti & Co.,
C/o. Jatia Industries (P) Ltd.,
18, Netaji Subhas Road.
Calcutta-1
Phone : 22-4644 (6 Lines)
Telex : CA7422

ভাবমুখে

অষ্টবিংশ বর্ষ	তেরশ' একাশি	চৈত্র	দ্বাদশ সংখ্যা

গান

শ্রীশ্রীঠাকুর

মাধবী কয় ফাগুন হাওয়া
দোলো দোলো দোলো
একটি কোঁটা সুরভি তার
বুকেই তোলো তোলো।
ঝরাপাতার চৈতী ডাকে
বেজেই হবে
যাবার আগে আমার কথা
চন্দ্রালোকেই বোলো।
আমার গানের গহন মীড়ে
মিলন হবে
যা আছে সুর সবটুকু তো
তারই হোলো হোলো।

27.3.64.

অচেতনের চেতন

শ্রীঅর্চনাপুরী

নিঃশব্দে চাঁদ জেগে থাকা আকাশ
আর মাটীর বুকে ঘুমন্ত মন
দুটোর মাঝে একটা বিরাট বোঝাপড়া
ঘটে না জাগরণে ?

আকাশ জানে তার অগাধ বিস্তৃতি
একটা নীরব শূন্যতায় স্তব্ধ
নিশিপ্ত জ্যোৎস্নায় সে শুধু ধরা পড়েছে
বিশেষ একটী কালে···
আর ঘুমন্ত মন ? তার আরো বিস্তৃত পরিধি নিয়ে
যেন তলিয়ে আছে একটা বিরাট
না-দেখা অতলে।
সেখানে আরো অনেক স্মৃতির ঘুম
অনেক মনের ঘুম
অনেক চাওয়ার ঘুম
ঐ আকাশ তার সাক্ষী···
সে জানে—ওরা ঘুমিয়ে আছে
কিন্তু স্বপ্ন দেখছে।

কি স্বপ্ন দেখছে ?
জাগার স্বপ্ন ?
আকাশ দেখছে—
সবাই ঘুমিয়েছে কিন্তু প্রহরী আছে জেগে
সে তার স্বপ্নের পথ চলাকে
অনুসরণ করছে ··
লক্ষ্য করছে তার জাগার স্বপ্নকে···
ওরা একদিন জাগবে—
কবে জানিনা, তবে একদিন যে জাগবে
এটা ঠিক···
সেদিন সব অচেতনের চেতন
উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে
একটী বিরাট চৈতন্যের আলোয়···
অচেতন চেতন সব এক হ'য়ে যাবে
সেই পরম চৈতন্যে
অসীম আকাশ
সীমার মনের পানে চেয়ে
এই প্রতীক্ষাই করছে।

★

সমস্ত জিনিষের পেছনে বা সমস্তের মধ্যে যত চৈতন্য সত্তার প্রকাশ দেখতে পাবে, যত চেতন বলে বিশ্বাস করবে, ততই নিজে চৈতন্য সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হবে।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

গীতার বাণী

সাধনাপুরী

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবানুবাচ

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ। ১

শ্রীভগবান বললেন—যঃ কর্ম ফলং অনাশ্রিতঃ (কর্মফলের অপেক্ষা না করে) কার্য্যং কর্ম করোতি (কর্ত্তব্য কর্ম করেন) সঃ সন্ন্যাসী চ যোগী চ (তিনি স্থানী সন্ন্যাসী এবং যোগীও), ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিহোত্রাদি শ্রৌত কর্মত্যাগী নয়) ন চাক্রিয়ঃ (সর্ব্ববিধ শারীর কর্মত্যাগীও নয়)।

শ্রীভগবান বললেন—কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করতঃ যিনি কর্ত্তব্যবোধে কর্ম করেন, তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। যিনি যজ্ঞাদি শ্রৌতকর্মাদি পরিত্যাগ করেছেন অথবা শরীর রক্ষার নিমিত্ত যাবতীয় কর্মত্যাগ করেছেন, তিনি সন্ন্যাসী নন। ১

অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ—পঞ্চম অধ্যায়ে শেষ তিনটি শ্লোকে, উপদিষ্ট হয়েছে যে ধ্যান যোগের কথা, সেটাই এই অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত হয়েছে। এখানে প্রথমেই ধ্যানযোগে অসমর্থ যে গৃহী, তার পক্ষে ধ্যানযোগের বহিরঙ্গ স্বরূপ কর্মযোগই যে শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সেটাই বর্ণিত হয়েছে। তাই বলে সকলের পক্ষে, সকল অবস্থাতেই কর্মের অনুষ্ঠেয়ত্ব কখনই সিদ্ধ নয়। আবার গৃহীর পক্ষে অন্তরঙ্গ সাধনস্বরূপ ধ্যানযোগও অনুষ্ঠেয় হতে পারে না—'একাকী যতচিত্তাত্মা', 'নিরাশীরপরিগ্রহঃ' ইত্যাদি কথাতেই বোঝা যায়, সেগুলি সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী বা যোগীর জন্য প্রযুক্ত হয়েছে; গৃহীর পক্ষে একাকী থাকা অপরিগ্রহ ইত্যাদি সম্ভব নয়। অতএব এগুলি গৃহীর জন্য নয়। ফলাসক্তি বর্জিত অবস্থাতে কর্ম করলেও সে যোগী বা সন্ন্যাসী পদবাচ্য হতে পারে এবং এখানে সেই উপদেশই দেওয়া হয়েছে—তাই বলে 'সর্ব্ব কর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে' ৫।১৩ ইত্যাদি শ্লোকে সর্ব্ব ত্যাগের কথাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর বর্ত্তমান শ্লোকেও সন্ন্যাসীর সঙ্গে কোন বিরোধ নাই (শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি, শ্রীধরস্বামী ও হনুমান)

অষ্টাঙ্গযোগ সমন্বিত কর্মযোগের উপদেশ দানে ইচ্ছুক হয়ে, প্রথমে দুটি শ্লোকে কর্মযোগের প্রশংসা করেছেন। আকাঙ্ক্ষা ও আসক্তি ইত্যাদি ত্যাগ করাই বড় কথা। যোগ মার্গে আরোহনেচ্ছু হলেই যে, যোগমার্গের জন্য সহসা সমস্ত কর্ম ত্যাগ করতে হবে, সেকথা এখানে বলা হয়নি বা বলা ঠিক নয় (রামানুজ, বলদেব ও বিশ্বনাথ)।

অনেকের ধারণা, প্রচলিত পন্থা সর্ব্বকর্ম ন্যাস ভিন্ন, সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। গীতায় ভগবান সেই প্রচলিত পন্থার সঙ্কীর্ণতা দূর করার জন্য, প্রথম দুই শ্লোকেই কর্মযোগের স্তুতিবাদের অবতারণা করেছেন। স্পৃহাশূন্যতাই আদর্শ সন্ন্যাসীর লক্ষণ, আবার চিত্তের বিক্ষোভশূন্যতাও আদর্শ যোগীর লক্ষণ, অতএব ফলাভিসন্ধিহীন কর্মীই সন্ন্যাসী ও যোগীপদবাচ্য (মধুসূদন, নীলকণ্ঠ)। অগ্নি অর্থাৎ সাধন মাত্র। যখন অগ্নির দ্বারাই যজ্ঞাদি সম্পন্ন হত, তখন অগ্নি আবশ্যকই ছিল কিন্তু বর্ত্তমানে মনে করা যায়, সেবার সাধন হচ্ছে চরকা, তবে সেটি ত্যাগ করলেই সন্ন্যাসী হওয়া যায় না (গান্ধীজী)।

গুরু যে বার বার বলেছেন, ভিতরের ত্যাগই প্রকৃত সন্ন্যাস, বাইরের ত্যাগ নয়—এখানে প্রথমেই সেই কথাটির ওপর জোর দিয়েছেন (শ্রীঅরবিন্দ)।

অগ্নি ও কর্ম্মের সংস্রব ত্যাগ করলেই যোগী বা সন্ন্যাসী হওয়া যায় না। কর্ম্মরত থেকে কিন্তু মাত্র ফলাকাঙ্ক্ষা যিনি রাখেন না, তিনিই যোগী বা সন্ন্যাসী। কায্য—কৃ+ণ্যৎ—দেহ রক্ষার্থ ও চিত্তশুদ্ধি জন্য কর্ত্তব্য (যোগানন্দ)।

চৈতন্যভাগবতেও পাই এই শ্লোকের অনুরূপ কথা :

গীতা শাস্ত্রে অর্জ্জুনের সন্ন্যাস লক্ষণ।
তুমি এই যে কহিয়াছেন নারায়ণ॥
নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ ভজন
তাহারে সে বলি যোগী সন্ন্যাসী লক্ষণ॥

(অন্ত খণ্ড—৩৪১ পৃঃ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর)

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ—কাম্যবিরোধী নিত্যানুষ্ঠেয় কর্ম্ম সম্পাদন যিনি করেন, তিনিই এস্থলে সন্ন্যাসী এবং যোগী বলে উক্ত হয়েছেন। নিষ্কাম কর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি সন্ন্যাসী ও যোগীর ন্যায় গুণসম্পন্ন সুতরাং তদ্গুণসম্বন্ধবাচ্য। অগ্নি প্রজ্বালন ক্রিয়া কর্ম্মানুষ্ঠানের মধ্যেও যদি আসক্তি, বাসনা, কামনা না থাকে তবে সেইটাই তখন সন্ন্যাসীর আদর্শের মত দাঁড়াবে, কেননা কর্ম্মফল সমস্তই চিত্ত বিক্ষেপের হেতু (শঙ্করাচার্য্য, আনন্দগিরি ও শ্রীধর)।

এতদ্বারা প্রতিপাদিত হচ্ছে যে, যারা যোগী বা সন্ন্যাসী হতে চান, সহসা কর্ম্মত্যাগ করা তাঁদের পক্ষে উচিৎ নয় (বিশ্বনাথ, ন্যায়াচার্য্য ও বলদেব)।

এস্থলে ফলাভিলাষ ত্যাগ করায়, একাধারে চিত্তবিক্ষেপহীন যোগী ও সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর আদর্শ লক্ষিত হয়। দুটি শব্দের যে প্রয়োগ আছে সেটি লক্ষ্য করার মত—এ দুটি দ্বারা নিরগ্নি সন্ন্যাসী অপেক্ষা এবং অক্রিয় যোগী অপেক্ষা এতাদৃশ সাগ্নিক সন্ন্যাসী, সক্রিয় যোগীর এরূপ প্রশংসা করা হল বলেই যে, নিরগ্নি সন্ন্যাসী এবং অক্রিয় যোগীর নিন্দা করা হয়েছে মনে করা ন্যায়সঙ্গত নয় (মধুসূদন)।

তৎকালীন সমাজে সন্ন্যাস আশ্রমের নিয়ম ছিল, শ্রৌত এবং স্মার্ত্ত কর্ম্ম সমস্ত ত্যাগ করে, কেবল ভগবৎ চিন্তা করা। সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগই ছিল সন্ন্যাসীর আদর্শ, সেটি তৎকালীন সমাজের উপযুক্ত ছিল। কিন্তু যুগ পরিবর্ত্তনের সঙ্গে নতুন পদ্ধতির প্রয়োজন হয়ে দাঁড়াল। সেই কর্ম্মত্যাগের আদর্শ পরিবর্ত্তন করে বললেন যে—যে কোন কর্ম্মই যদি কর্ত্তব্য-বোধে করা যায়, তাতে ফলকামনা না থাকে, তখন সেই অবস্থাকেও সন্ন্যাস অবস্থা বলা যেতে পারে। কাজেই গীতা মতে সন্ন্যাস হচ্ছে কর্ম্মফল সন্ন্যাস ; কর্ম্মসন্ন্যাস নয়। অনাসক্ত হয়ে নিজ নিজ ইষ্ট বা পুরুষোত্তমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্ম্ম করাই গীতার আদর্শ এবং সন্ন্যাসীর উত্তম লক্ষ্য। মনে মনে সমস্ত কামনা বাসনা রয়েছে অথচ শ্রৌত স্মার্ত্ত ইত্যাদি কর্ম্মত্যাগ করে ভিক্ষার দ্বারা জীবনযাপন করাকেই, সন্ন্যাসীর লক্ষণ গীতায় ভগবান একথা বলেন নি। যোগের ক্ষেত্রেও তাই (বেদব্যাস)।

কামনা বাসনা ফলাশ্রিত কর্ম্মাশ্রিত নয়। মানুষের কামনা বাসনা চায় অভিলষিত ফল, সেইজন্যই কর্ম্ম করা। সাধারণতঃ আমরা অনেক কাজ করি—যার সঙ্গে ফলের সম্বন্ধ নাই, তার প্রতি আসক্তি বা বন্ধনও নাই, কিন্তু যার দ্বারা আমরা ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তিকর কিছু পাই, ফললাভ করি—সেইটিতেই আমাদের মন আসক্ত বা বন্ধনগ্রস্ত হয়। আমরা কেবল ভাল ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, কর্ম্মফল বা সুখ সেইটিই আমরা চাই যেমন—নিজের দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদির সুখ বা ফল, সকলের বিশেষ কাম্য। গণ্ডীর পরিধি বাড়ালে, আত্মীয়স্বজনদের কাম্যফল সুখ-সুবিধাতে আমাদের নিজের চেয়ে তুষ্টি বা চাহিদা কম, আবার পরিধি আরো বাড়ালে, দেশের ও দশের কুশল, সুখ বা ফললাভ এতে আমাদের তুষ্টি বা interest আরো কম। আর ভগবানের প্রীতির যে ফল, তার গণ্ডীর পরিধি সবচেয়ে বেশী। সেখানে আমাদের আসক্তি বা চাহিদা নেইই একরকম।

মহর্ষি জৈমিনির পূর্বমীমাংসা মতে কর্ম শেষ হয়ে গেলে, সেই সঙ্গে এক অদৃষ্ট শক্তির উৎপত্তি হয়। জৈমিনি এই শক্তির নাম দিয়েছেন 'অপূর্ব।' এই অপূর্বই বহুকাল পরেও পূর্ব কর্মজনিত ফল উৎপাদন করতে পারে। সেইজন্য দেখা যাচ্ছে কর্ম এবং ফল অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। কিন্তু জৈমিনি তাঁর পূর্ব মীমাংসায় মোক্ষের কথা উল্লেখ করেন নি। পরবর্তী মীমাংসক প্রভাকর মোক্ষের স্থান দিলেন তাঁর মতে ধর্ম ও অধর্মই বারংবার জন্মমৃত্যুরূপ দুঃখ দুঃখের কারণ। বৈদিক পুণ্য ক্রিয়া-কলাপের ফলে স্বর্গসুখ লাভ হয়, কিন্তু সেটি চিরস্থায়ী নয়। সংসারে সুখ ও দুঃখ মিশ্রিত। এই সুখ দুঃখ হতে নিষ্কৃতির উপায় হচ্ছে মোক্ষ। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা বিষয়ের সঙ্গে আত্মার সংযোগ হতেই সংবেদ ও মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয়। মুক্ত আত্মা দেহ বিমুক্ত হওয়ায় ইন্দ্রিয় ও মনের সঙ্গে তার সংযোগ ছিন্ন হয় সুতরাং সংবেদ থাকে না। এখন সুখ দুঃখের অতীত অবস্থায় পৌঁছলেই মোক্ষ। গীতার আদর্শ নিষ্কাম কর্মযোগ 'জ্ঞেয়ঃ স নিত্য সন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।' এই নিষ্কাম ভাবের কথা পূর্বমীমাংসার মোক্ষ সম্বন্ধে আলোচনাতেও পাওয়া যায়। আবার পাশ্চাত্য দার্শনিক কান্টের duty সম্বন্ধেও এই ধরণের কথা পাই—'Never as a means only, but always equally as end' অর্থাৎ ফলের দিকে লক্ষ্য নয় কার্যই হবে লক্ষ্য (The concise Encyclopaedia of Western Philosophy and Philosophers—J. Urmson. P. 207) কাজেই গীতায় ভগবানের বাণী কর্মফলের আকাঙ্ক্ষা না রেখে কর্তব্যবোধে কর্ম করে যাওয়াই বড় কথা (বেদচ্ছন্দা)।

গীতার অন্যত্র

সন্ন্যাসঃ—৪৷১৮, ৫৷৩, ২৷১৮, ৭—৩৷৫ কার্য—১৮৷৩, ২৪৷১৬, ৫৷১৮, ৯৷১৮, ৩০৷১৮, ৩১৷১৮ কর্ম—৪৭৷২, ১৫—১৮৷৪।

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মরণে

স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ

শম্ভু নাম করিলে সার্থক
ভক্তি জ্ঞান না ছিল পৃথক।
দেশ দেশান্তর হতে
জ্ঞানাঞ্জন আনিলে সাথে।
কথায় বার্তায় ঝরত মধু
জ্ঞান দানে ছিলে সাধু।
সর্বজন হিতার্থে
ত্যাজিলে তুমি স্বার্থে।
দিনলিপি রহিয়াছে লেখা
দ্রষ্টা সত্যানন্দ পিতা।
পিছনের ফেলা দুয়ারখানি
ভুলেও কোনদিন ভাবনি।

অল্প বয়সে ছাড়ি জমিদারী
ত্যাগব্রতী হয়ে ঈশ্বরে পূজারী!

গুরুর প্রতি অচলা ভক্তি
আজি দেখি তার অভিব্যক্তি।

আশ্রমের নিজ কর্তৃত্ব ফেলিয়া
শ্রীগুরুচরণে রহিলে পড়িয়া।

বারে বারে শত যন্ত্রণা আসে
নামের ধ্বনিতে যায় ভেসে।

সদানন্দে রহিতে সদা
চিনেও চিনিতে পারিনি হেথা।

জন্মদিনে

শ্রীশরণাপুরী

আজকের এই জন্মদিনে
শুধু একটা কথা বলতে চাই
তেমনি করে দাঁড়াও এসে
আর তো কিছু চাহিনা নাই
তোমার তরে আসন পাতি
রাখিয়া হে বুকের সাথী
কত না দিন রাত্রি ধরি
করছি শুধু প্রতীক্ষাই।

গঙ্গার ঢেউ উঠেছে দুলে
নাচে কুরুবৃড়ার মন
হিন্দোলাতে বনের বীণা
ডাকছে তোমায় সারাটিক্ষণ
শ্যামল সেই শোভন বেশে
তেমনি করে দাড়াও হেসে
সুনীল ঘন নয়ন মেলে
স্নিগ্ধ করো ভুবনটাই
আরো তো কিছু চাহিনা নাই।

বসন্তের প্রথম ক্ষণে
মধু-বুকে শুভরণ
আকুল হয়ে ব্যাকুল হয়ে
তোমার সাথে অনুক্ষণ
পত্রলতা দিয়া গো ধুলে
রেখেছি ধূপ দীপটি জেলে
আবার এসো ফিরিয়া এসো
এই নিখিলে লও গো ঠাঁই।
আর তো কিছু চাহিনা নাই।

সোনার আলো ছড়িয়ে পড়ে
আঁধার ঘন ঘোর কাটে
মন হারানো মনের সাথী
খোঁজে বাউল ভুল বাটে
নিত্য তোমার দরশ তরে
পরাণ শুধু গুমরে মরে
দাও গো দেখা হে হরাময়
সকল ব্যথা ভুলে গো যাই।
আর তো কিছু চাহিনা নাই।

ছড়িয়ে গেছে দিগাঙ্গনে
অমৃত ফুল গন্ধ তার
কোকিল ফুল ডাকে গো তোমায়
নাই কো বুঝি ক্লান্তি তার
ধন্য করো এই ধরণী
কমল দুটি চরণ খানি,
স্বপনে নয় ধেয়ানে নয়
এই নয়নে দেখতে চাই।
প্রভু—আর তো কিছু চাহিনা নাই।

●

মৃত্যু আমার কাম্য নহে, দেব জীবনই আমি চাই। আমি শ্রীঠাকুরের নামে তোমাদের আশীর্বাদ করি যেন দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হ'য়ে—'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়' কাজ ক'রে যেতে পার।

—শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

রঙ্গরাঙ্গ কুমায়ূন

শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৩রা সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার। আমরা আলমোড়া থেকে বাসযোগে কাপ্‌কোট বা ভাড়াড়ির পথে সকাল সাতটায় রওনা হলাম, মাত্র একগ্লাস করে গরম দুধ পান করে। আলমোড়া থেকে ভাড়াড়ি প্রায় ৭০ মাইল।

পাহাড়ী পথ। বাস চলে এঁকে বেঁকে কোশী নদীর পাড় ধরে। রাণীক্ষেতের রাস্তা বাঁদিকে পড়ে। বাস কখনও ওঠে, কখনও বা নামে। দূরের পাহাড় কাছে এসে যেন নিঃশব্দে হাতছানি দিয়ে আবার দূরে চলে যায়। কোথাও পাহাড়ের ধাপে ধাপে চাষ আবাদের সোনালী ফসল, আবার কোথাও বা সবুজ ক্ষেতের বুকে বাতাসের ঢেউ ওঠে।

আলোর ঝর্ণাধারা নামে উপত্যকার বুকে। পাহাড় থেকে পাহাড়ের বুকে ইঞ্জিনের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে শান্ত জননীর কোলে—দুরন্ত শিশুর মতো। কখনও নদী কাছে আসে—কখনও বা চলে যায় দূরে। পথের পাশে এবং দূরে ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম চোখে পড়ে। কাঠ ও পাথরের তৈরী ঘর বাড়ী। বাস এসে থামে—সুন্দরী কুমায়ূনের রমণীয় উপত্যকা সোমেশ্বরে। উচ্চতা—৪৭০০'। দূর আকাশের বুকে ধবল পর্বতমালা। মুক্ত ধারায় আঁকা বাঁকা চঞ্চলা কোশী নদী ছুটে চলেছে। শিবতীর্থ এই সোমেশ্বর। বাস স্ট্যাণ্ডের কাছেই সোমেশ্বরের প্রাচীন মন্দির যাত্রীদের ওঠা-নামা শেষ হলে বাস আবার চলতে থাকে, প্রকৃতির শান্ত নীরবতা ভঙ্গ করে অনবিরল পথ। শুধু শব্দ তুলে ছুটে চলে যাত্রীভরা বাস। মাঝে মাঝে মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তুষার শৃঙ্গমালা যেন লুকোচুরি খেলে মনে শান্তির পরিতৃপ্তি আনে প্রশান্ত প্রকৃতি। বাস এসে থামে স্বর্গীয় শোভায় শোভিত 'কৌশানীতে'। উঁচু ৬৬০০'। এ যেন প্রকৃতির আপন হাতে গড়া সৌন্দর্যের এক অপরূপ নিকেতন। সৌন্দর্য পিপাসুদের লীলাভূমি। নীল গগনের বুকে সাদা সাদা পেঁজা মেঘের আনাগোনা। শরৎ রাণী যেন আপন মনের মাধুরীর আলপনায় কৌশানীর অঙ্গরাগ নিপুণ হাতের তুলিতে এঁকে দিয়েছেন। সূর্য কিরণে—জ্যোতির্ময় তুহিন শৃঙ্গমালা নবরঙ্গে যেন যাত্রীদের স্বাগত জানায়। মাঝে মাঝে মেঘমালার অন্তরালে মৌন মহান্ গিরিরাজ পথিকের সাথে লুকোচুরি খেলেন—অবলুপ্ত হন। আবার রঙ্গমঞ্চের যবনিকা ওঠে—দর্শন পিপাসু পথিকের মনের অবসাদ দূর করার জন্য। এ যেন ঘুমঘোরে দেখা আবেশভরা এক স্বপ্নরাজ্য। মাঝে মাঝে কুয়াশার অবগুণ্ঠনে গিরিরাজকে যেন আড়াল করে দেওয়া হয়। সুনীল আকাশে মেঘেরা যেন দিনমণিকে ঘিরেই কি এক অজানা অজ্ঞাত প্রতিবাদে রত। সব কিছুই যেন মুছে যায়—আকাশের বুকে। আবার পর মুহূর্তেই দিবাকর কুয়াশার পর্দা ভেদ করে এবং মেঘের প্রতিবাদ তুচ্ছ করে গগন মঞ্চে আবির্ভূত হয়। রাঙা আলোর মেলায় ঝল্‌মল্ করে ওঠেন গিরিরাজ। দূর গগনের সোনালী আলোতে মনের প্রদীপ যেন জ্বলে ওঠে। এই কৌশানী থেকেই রূপকুণ্ডে যাবার আলাদা পথ চলে গেছে, গোয়ালদামের দিকে। শঙ্কর, বৈজনাথ, বাগেশ্বরকে পিছনে ফেলে বাস কাপ্‌কোট হয়ে ভাড়াড়ি এসে পৌঁছায় বেলা চারটায়। উচ্চতা ৩৭৬০'। কুমায়ূনের পাদদেশে সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত। বাসের রাস্তার এখানেই শেষ। হাঁটা পথের শুরু হবে। তাই সবকিছু ঠিক করে নিতে হবে। কুলিরা মালপত্র বাসের উপর থেকে নামিয়ে নেয়। এ অঞ্চলের প্রধান বিষাণ সিং। তার দোকানের সামনেই সকলে বাস থেকে নেমে দাঁড়াই। প্রথমেই চোখে পড়ে বিষাণের শান্তরূপ। সে তখন তার বৃদ্ধ পিতার সেবায় রত ছিল। বাবাকে গরম দুধ পান করিয়ে মুখ মুছিয়ে হাতে গড়গড়ার নল তুলে দিয়ে আমাদের অভ্যর্থনা জানালো। করজোড়ে প্রণাম করে জানতে চাইল—আমরা পিণ্ডারির যাত্রী কি-না। পরে রাতের মত আমাদের থাকা খাওয়া এবং পথের যাবতীয় বন্দোবস্ত—কুলি, রেশন

প্রভৃতি নিজেই ঠিক করে দিল। কুলি এল ৪ জন। তাদের ভিতর একজন মেট। তার নাম ভীমরাম। বাকী ৩ জন পন্নারাম, রামোরাম, ও ভরতরাম। পারিশ্রমিক ঠিক করা হল—মেট পাবে ১৲ করে প্রত্যেক মাইলের জন্য এবং কুলিরা পাবে ৭৫ পয়সা করে।

ধীরে ধীরে গোধূলি নেমে এলো। কুমায়ুনের কোলে তাড়াতাড়ির শান্ত ম্লান চোখে পড়ল। অস্তগামী সূর্যের রাঙা আবির—মেঘের কালর রক্তিমাভ। উত্তরে ধ্যানমগ্ন গিরিরাজের শুভ্র চূড়া দিনমণির ক্লান্ত কিরণের ছটায় ঝল্‌মল্। কিন্তু গিরিরাজ নির্বিকার।

আকাশ ভরে তারার ফুলফুটে ওঠে। গিরিশৃঙ্গের পিছন থেকে চন্দ্রদেব আবির্ভূত হন। চারুচন্দ্রিমার রূপালী আলোয় গিরিরাজ যেন হেসে ওঠে। জ্যোৎস্না-স্নাত জ্যোতির্ময়ের মনোমুগ্ধকর রূপে মনে আনে অপার শান্তি। ৪ঠা সেপ্টেম্বর বুধবার ভোর চারটায় সকলের ঘুম ভাঙল। সরযূর ধারে প্রাতঃকৃত্য সেরে নিলাম। আস্তানার কিরে মালপত্র বেঁধে গোছগাছ করতে সকাল ৬টা হয়ে গেল। পলিথিনের ঠোঙায় শুকনো খাবার ভাগ করে প্রত্যেকের কাঁধের ঝোলায় দিয়ে দেওয়া হল। কুলিরা মালপত্র ভাগ করে দড়ির সাহায্যে পিঠে বেঁধে নিল। মুড়ি, রুটি দিয়ে এক কাপ করে চা পান করে নিলাম। সকাল সাড়ে ছ'টায় সূর্য প্রণাম করে এবং গিরিরাজকে স্মরণ করে যাত্রা শুরু হল। আজ আমাদের লোহারক্ষেত বাংলোতে পৌঁছোতে হবে। লোহারক্ষেত তাড়াড়ি থেকে ১ মাইল। উচ্চতা ৫৭৫০'।

শিশু তপনের আলোক মালায় ছিন্নোলিত হয়ে ওঠে প্রকৃতি। পাহাড়ের কোল ঘেঁসে পথ—পথের এক পাশে পাহাড়, অপরদিকে বেগবতী সরযূ। এ পথে চড়াই কম। চলার পথের দু'ধারে মনোরম দৃশ্যে পথের কষ্ট বেদনাদায়ক বলে মনে হয় না। প্রতিটি পদার্থই যেন কোন এক অদৃশ্য হাতের ছোঁয়ায় মুখর এবং প্রাণবন্ত। প্রতিটি পদক্ষেপে তাঁর করুণা উপলব্ধি করতে পথিক হয় বাধ্য। ঝাঁকে ঝাঁকে ঝর্ণার ধারা নেমে প্রাণ মাতিয়ে দিয়ে যায়। দু'ধারে ধ্যানমগ্ন পাহাড়ের সারি সবুজ পোষাকে যেন দাঁড়িয়ে আছে—পথচারীদের নীরবে স্বাগত জানাতে। পথের সাথী হিসাবে যে চারজন পাহাড়ী কুলি আছে, মনে হয় এরা খুবই গরীব, তবে এত সৎ এবং বিশ্বাসী যা শুধু অনুভব করাই সম্ভব। ভাষা দিয়ে বোঝান বেশ কষ্টসাধ্য। আরও এক সাথী চলেছে সাথে সাথে—অনন্ত চঞ্চলা সুরধুনী সরযূ। তার একতানের গর্জন-সঙ্গীতে পথিকের শ্রান্তি ও ক্লান্তি লাঘব করে দেয়। জলের রূপ যে এত স্বচ্ছ এবং প্রাণ ভোলানো হতে পারে, তা এর আগে কখনও অনুভব করার সুযোগ আমার জীবনে ঘটেনি। বেলা দুটোয় লোহারক্ষেতের বাংলোয় এসে পৌঁছালাম। শ্যামল উপত্যকার বুকে ছবির মতো এই বাংলোটি। পথে প্রভুর নাম কীর্তনে একটু আনমনা ছিলাম—বাংলোতে এসেও কীর্তন চলছিল। হঠাৎ কাঁধের উপরে পেছন থেকে একখানা করুণা মিশ্রিত হাতের পরশে ঘোর কাটল। ফিরে তাকিয়ে দর্শন করি এক সৌম্যমূর্তি। স্মিত হাস্যে বললেন—"যা বেটা, বহুৎ আচ্ছা"—বয়সে প্রবীণ, নিটোল কান্তি জ্যোতির্ময় পুরুষ। নাম তাঁর নারায়ণ স্বামীজী। ভক্তিভরে প্রণাম করলাম। জিজ্ঞাসা করলেন—"কাঁহা যায়েগে বেটা, পিত্তোরি?" সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়লাম। একটু হেসে বল্লেন—"আভিতো ঠক্ গিয়া। সামকো মেরা ঝোপড়িমে আনা।"

দুপুরের খাওয়ার পরে একটু বিশ্রাম করে নীচে বাংলোর পূব পাশে স্বামীজীর আস্তানায় গিয়ে হাজির হলাম। দুখানা টিনের চালার নীচে তাঁর এই আস্তানা। মিষ্টি হেসে স্বামীজী বসতে বললেন। পাহাড়ের পথে চলার জন্য তিনি যে সকল একান্ত প্রয়োজনীয় উপদেশ আমায় দিয়েছিলেন সেইগুলি এইরূপ :—

(১) চড়াই ওঠার আগে, প্রতিটি পর্বতকে দেবতা জ্ঞানে প্রণাম করে মনে মনে অনুরোধ জানাবে—"প্রভু, আমি তোমার কোলে যত সময় থাকব, আমার রক্ষণাবেক্ষণের ভার সম্পূর্ণরূপে তোমারই।"

(২) তাড়াহুড়ো একান্তভাবে বর্জন করে চলবে। ধীর স্থির ভাবে প্রতিটি পদক্ষেপ নেবে। যেন পদক্ষেপে হুৎপিণ্ডে ধাক্কা না লাগে।

(৩) হাঁফ ধরলে দু-এক মিনিট দাঁড়িয়ে নাক দিয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাস চালাবে। কখনও মুখ খুলে শ্বাস গ্রহণ করবে না। হাঁফ ছাড়লে আবার চলা শুরু করবে।

(৪) পথ চলার সময় ধূমপান নিষিদ্ধ। ঘাম হবে, কিন্তু কষ্ট হলেও গায়ের জামা কখনই খুলবে না।

(৫) চড়াই ভাঙার সময় কখনও উপরের দিকে তাকাবে না। উৎরাইয়ের সময় গোড়ালি এবং লাঠিতে ভর দিয়ে নামবে।

(৬) পথে বৃষ্টি হলে খুব সাবধানে পা ফেলবে। অন্যমনস্ক কখনই হবে না। নজর পায়ের দিকে রাখা সর্বক্ষণই একান্ত কর্তব্য।

(৭) বহু ঝর্ণা পথে পাবে। সব ঝর্ণার জলই স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল। তবে সূর্যের আলো যে ঝর্ণায় কম, সে জল পান না করাই শ্রেয়।

আরো জানালেন যে, "খাতি থেকে দোব্বেলীর মাঝে দুটি লোহার পুল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তবে আমার পরিচিত এবং ভক্ত খাতির রতন সিংকে একখানা চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেব—তোমাদের নদী পারের সাহায্যের জন্য। আমার বিশ্বাস, সে তোমাদের যথাসাধ্য সাহায্য করবে।" বাংলোয় ফিরে এসে বাড়ীতে চিঠি লিখতে বসেছি। এমন সময় একজন কুলি এসে কিছু টাকা অগ্রিম চাইল। নাম তার রামরোম। তার বাড়ী বাংলো থেকে দেড় মাইল দূরে। তার মায়ের অসুখ। তাই সে বাড়ীতে কিছু টাকা দিয়ে যেতে চায়। টাকা দিয়ে তাকে অনুরোধ করা হলো যে, সে যেন রাত ৯টার ভিতরেই বাংলোতে ফিরে আসে। কারণ—আগামীকাল ভোর ৪টায় আমরা ঢাকুরীর পথে রওনা হতে চাই। কিন্তু সে পরদিন বেলা ৮টা পর্যন্তও যখন ফিরে এলো না, তখন আমরা বড়ই চিন্তায় পড়লাম। কিন্তু স্বামীজী কৃপা করে একজন নতুন কুলি ঠিক করে দিলেন। একেও আমরা মেট হিসাবেই নিলাম। এই নতুন কুলির নাম পানীরাম। লম্বা চেহারা, লোহারা গড়ন। ৫ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার। সকাল প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরীর পথে রওনা হলাম। লোহারক্ষেত থেকে ঢাকুরী প্রায় ৬½ মাইল। ঢাকুরী বাংলো প্রায় ৯ হাজার ফুট উঁচুতে। কুলিজনিত বিভ্রাটে আমাদের যাত্রা শুরু করতে প্রায় ৩ ঘণ্টার উপরে দেরী হয়ে গেল। অজিত বাবু এবং সুবোধ বাবুকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল সকাল ৬টায় দুজন কুলি সমেত। সাড়ে আটটার পরে নববাবু, তাঁর স্ত্রী এবং আমি যাত্রা সুরু করলাম। লোহারক্ষেত বাংলো থেকে ঢাকুরীর চড়াই প্রথম থেকেই শুরু। এ চড়াই-এর খাড়াই এবং বিস্তার উভয়ই বেশ কষ্টসাধ্য। পথ প্রায় জনমানবশূন্য বলা যায়। রাস্তার দৃশ্যও প্রায় একইরকম। তৃষ্ণা দূর করার জন্য ঝর্ণার জল ছাড়া আর কিছুই এ পথে মেলে না। কুলি পানীরাম আছে সাথে, আমার কষ্ট দেখে সে সান্ত্বনার সুরে কিছুক্ষণ পর পরই বলে "বাবু এর পরে আর চড়াই নেই। আর একটু চলুন সামনেই আমরা ভাল রাস্তা পাব।" প্রথমটায় আশা হয়, কিন্তু কিছু সময় পরে বুঝি যে, সে আশার সকারণ শুধু আমার পথের শ্রান্তি লাঘবের জন্যই মাত্র। মনে হয়েছিল যে, এত কষ্ট জীবনে বোধহয় আর কখনো অনুভব করিনি। যাইহক, বেলা প্রায় সাড়ে চারটের সময় বহু আকাঙ্খিত ঢাকুরী বাংলোতে পৌছানো গেল। ঢাকুরী বাংলো, ঢাকুরী চড়াই থেকে প্রায় ১৫০০´নীচে। বাংলোয় পৌছে দেখি সুবোধ আমাদের জন্য ভীম সিং-এর সহায়তায় ডাল এবং ভাত তৈরী করে অপেক্ষা-রত। এদেই যেতে বসে গেলাম। ডাল, ভাত যে এত সুস্বাদু হতে পারে তা এর আগে জানা ছিল না। খাবার শেষে বাংলোর বাইরে এসে ডেক্ চেয়ারে সবাই মিলে বসি। বাংলোর বাইরে মনে হয় সবুজ গালিচা পাতা। মিঠে মিঠে রোদ, ঝক্‌ঝকে ঠাণ্ডা, পশ্চিমের আকাশ গোধূলির ধূলিতে রাঙা। মেঘের দল ছুটে চলেছে নীল আকাশের বুকে। উত্তরে অস্তাচলগামী সূর্যকিরণে উজ্জ্বল তুহিন শৃঙ্খলা। এ যেন অপরূপ জ্যোতির্ময়—ধ্যানগম্ভীর মূর্তি। অস্তমান সূর্যের রাঙা আবিরে মেঘের পর্দাগুলো যেন রঙীন হয়ে ওঠে। একে একে শিখর হতে শিখরে আলো প্রতিফলিত হয়। চক্রাকারে চোখে

ধরা পড়ে অসংখ্য পুষ্পমালা। নানা রঙের উজ্জ্বল মুকুটে সুশোভিত গিরিরাজ। দিগন্তের পূব থেকে পশ্চিমে বিস্তৃত শিখরগুলির ভিতরে রয়েছে নাম্পা (২২২০০´), ট্রেলস গিরিবর্ত্ম (১৮০০০´), নন্দাকোট (২২৫০০´), শিওারি (১৩৭০০´), নন্দাদেবী (২৫৭৪০´), নন্দাদেবী পূব (২৪৪০০´), ত্রিশূল (২৩৪০০, ২২৪০০´, ২২৫৩০´), নন্দাখুর্টি (২০৭০০´) এবং নন্দাকোট (২১০০০´) যতদূর দৃষ্টি যায় শুধু চোখে পড়ে শ্বেতশুভ্র তুষারের ঢেউ এর উপর ঢেউ। শত সহস্র বাহু প্রসারিত করে গিরিরাজ যেন প্রেমে ভরা হৃদয়ে আমাদেরই আহ্বান জানাচ্ছেন নীরবে। এ যেন এক নিপুণ অদৃশ্য শিল্পীর হাতে অনিন্দ্যসুন্দর অপরূপ সৃষ্টি। প্রকৃতির রূপলীলায় মন এবং প্রাণ কানায় কানায় ভরে উঠল। অজান্তে মন ছুটে যায় সেই অদৃশ্য শিল্পীর শ্রীচরণ বন্দনার তরে। ধীরে ধীরে দিনের আলোটুকু লুকিয়ে পড়ে পশ্চিমের দিগন্তে। তারায় তারায় নীল গগনের বাগান সেজে ওঠে। নির্বাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখি এই অপূর্ব্ব প্রকৃতির মহান ছবি। শুধু ভাবি আর ভাবি—"ওগো মহান্ শিল্পী! তোমার শিল্প যদি এত মনোমুগ্ধকর, না জানি তুমি কতই সুন্দর।" ঠাণ্ডায় বাইরে বসে থাকা আর সম্ভব হলো না। বাইরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ থেকে নিজেদের বঞ্চিত করতে বাধ্য হলাম। বাংলোয় ফিরে এলাম সবাই। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। আঙুলের মাথা কেটে যেন রক্ত বেরোতে চাইছে। শ্বাস-প্রশ্বাস যেন একটু টেনে টেনে নিতে হচ্ছে। তাই ঘরের ভিতরে চুলিয়া আগুন জ্বেলেছে—শীত নিবারণের জন্য। রাত আটটার ভিতরে নৈশ ভোজন সমাপ্ত করে সকলে এসে প্রভুর ভজনে বসলাম। আমার শরীর খারাপ থাকায় শুধুমাত্র এক কাপ কফি ছাড়া আর কিছুই খেলাম না। অন্য দিনের তুলনায় আজ একটু তাড়াতাড়িই সকলে শুয়ে পড়লাম। (ক্রমশঃ)

★

শুনুন, শুনুন, গোপন কথা বলছি

শ্রীকিরণ সিংহ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

বিস্মরণ মানুষের স্বভাব। যা কিছু মহান তাই মানুষ ভুলে যায় অথচ যা অতি ক্ষুদ্র চব্বিশ ঘণ্টা তারই স্মরণ থাকে। তাইতো পরমাত্মাকে স্মরণে রাখতে হয় কিন্তু কামনা-বাসনাকে স্মরণ করতে হয় না, সে খুশি মনে থাকে। নীচের দিকে নেমে যেতে কোন কষ্ট হয় না, পাহাড়ে উঠতেই যত কষ্ট। এই কারণে গ্রামের মধ্যে নির্মিত হোত মন্দির যাতে করে দিনে দশবার অন্তত মন্দিরের নিকট দিয়ে যেতে হয়। আর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের আকাঙ্খাকেও নিরন্তর জাগ্রত রাখে। পৃথিবীতে যদি উড়োজাহাজ না থাকতো তবে উড়োজাহাজে করে উড়ে যাওয়ার কোন আকাঙ্খাই হোত না। তবে কোন এক রাইট ব্রাদার্স দের হয়তো মনে হত। কোন একজন উড়োজাহাজের কল্পনা করে, তাকে তৈরী করে, কেননা এটি তৈরী করার আকাঙ্খা তার জাগে—আপনার, আমার জাগে না। উড়োজাহাজ দেখলেই তবে আমাদের ইচ্ছা জাগে। কোন কিছু দেখলে তবে তাকে পাবার আমাদের ইচ্ছা হয়। এই ভাবে পরমাত্মার কোন না কোন এক সাকার রূপ মন্দিরের রূপে আমাদের কাছে ধরা পড়েছিল। বিশেষ করে এটি তাদের মনেই জেগেছিল যারা নিরাকারের জন্যে মোটেই ব্যাকুল ছিল না। যারা নিরাকারের জন্য উৎকণ্ঠিত ছিল তাদের কাছে মন্দিরের কোন প্রশ্নই ছিল না। এই কারণে তারা মন্দিরের অনেক ক্ষতি সাধনও করেছে। এতে শুধু ভুলই হয়েছে। কেননা, যাদের আকার থেকেই কিছু স্মরণে আসে না তাদের নিরাকার থেকে আসবে কি করে? খাওয়া-পরা, অফিস-কাছারী, ধন-দৌলত, স্ত্রী-পরিজন

ছাড়াও জীবনে আরও কোন এক আকাঙ্খা কোন এক ব্যাকুল প্রতীক্ষা জেগে ওঠে, যার দ্বারা না মিলবে ধন-দৌলত, না মিলবে কোন যশ-গৌরব। সেই আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক হয়ে মন্দির এসে দাঁড়াতো আমাদের সামনে। জীবনে এমন এক সময় আসে যখন সব কিছুই ব্যর্থ বলে মনে হয়। মানুষ বাজারে গিয়েও সুখ পায়না ঘরে থেকেও সুখ পায় না। মন্দির তখন উন্মুক্ত করে দেয় তার অবারিত দুয়ার। আপনি এসে বসেন আর সোয়াস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচেন। তাইতো পরবর্তী কালে যেখানে মন্দির রইল না সেখানে কষ্টের আর সীমা রইল না। কেননা, মন্দিরের বিকল্প কোন ব্যবস্থা আর হোল না। অথচ ঘরে আপনার সুখ নেই, বাইরে গিয়েও সোয়াস্তি নেই। অবস্থা হয়ে ওঠে এমন, যখন মুখ দিয়ে আপনা থেকেই বেরিয়ে আসে—"বল মা তারা দাঁড়াই কোথা"? মন্দির ছিল এক অন্য জগৎ, যেখানে ব্যবসা-বাণিজ্যের কোন প্রশ্ন ছিল না। যারা মন্দিরকে বাজার তৈরী করল তারা মন্দিরকে নষ্ট করেছে, যারা মন্দিরকে দোকান করল তারা একে ধ্বংস করেছে। মন্দির কোন দেনা-পাওনার ক্ষেত্র নয়। এখানে শুধু বিরাম আর বিশ্রাম। জীবনে যখন আপনি শ্রান্ত, ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছেন তখন এখানেই মেলে মাথা গুঁজবার ঠাঁই। এখানে কোন শর্ত নেই, নেই কোন দাবী—আপনি এই শর্তে এখানে আসুন। এত ধন হলে তবে আসুন কিংবা এতটা জ্ঞান হলে আসুন এতখানি প্রতিষ্ঠা হলে তবেই আসতে পাবেন। এখানে কোন শর্ত নেই। আপনি যেমন আছেন, মন্দির আপনাকে সেই ভাবেই স্বীকার করে নেবে। আর এমন কি কোন জায়গা আছে যেখানে আপনি যেমনটি, তেমনি ভাবেই আপনাকে স্বীকার করে নেবে?

মানুষের জীবনে কোন না কোন সময় এমন অবস্থা আসে যখন বীতশ্রদ্ধার সৃষ্টি হয়, আপনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। ঠিক এই সময়েই প্রার্থনার দুয়ার যায় খুলে। একবার যদি এই দুয়ার আপনার ভেতর উন্মুক্ত হয়ে যায়, তবে অফিসেই হোক্ আর ঘরেই হোক এটি খোলা থাকবে। এটি নিজের কাছেই হওয়ার প্রয়োজন। কেননা, আপনার ভেতর, যেটাকে আমরা আকাঙ্খিত অংশ বলি, সেটি খুবই কম। কখনও বা এটা ক্ষণিকের জন্যেই আসে। কাজেই এই স্বল্পতম ক্ষণটুকু আপনার নিকটেই হওয়া বাঞ্ছনীয় যাতে আপনি প্রবেশ করতে সক্ষম হন। এই স্মৃতি আনে এক দুর্লভ পরিণাম। যেমন ছোট শিশু—আমরাও একদিন এই ছোট শিশুই ছিলাম আর যে হবে সেও হবে ছোট শিশু অথচ বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, সাত বছরে শিশুরা যা কিছু আধারভূত তার প্রায় সবই শিখে নেয়। পরে এই আধারেরই বিস্তৃতি হয়। কিন্তু একটা নূতন কিছু, আর শেখা কষ্টকর হয়ে পড়ে। তাই যদি আমরা সাত বছরে শিশুদের মন্দিরের সঙ্গে যুক্ত করে না দিই, তবে পরে যোগসাধন হওয়া প্রায় অসম্ভব হয়ে যায়। আর যুক্ত হ'লেও এটি গভীর ভাবে যোগ হবে না, উপরে উপরে কাজ চালানো গোছের হয়ে পড়বে। এই জন্যেই শিশু জন্ম গ্রহণ করলেই তাকে আমরা মন্দিরের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাইতাম। সে বড় হয়ে উঠবে মন্দিরের নিকটে, মন্দিরকে দেখতে দেখতে মন্দিরের সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবে। বড় হয়ে যখন জীবন শুরু করবে তখন তার ভেতর মন্দিরও এক স্থান পাবে, যেখানে সে জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এক পরম বিশ্রামস্থল খুঁজে পাবে। জীবনের সমস্ত দৌড়ঝাঁপের পর এই নিরালা কোনটি হবে তার শেষ জীবনের আশ্রয়-স্থল। এটি আমরা প্রথমেই তৈরী করে দিতাম। একবার এটি তৈরী হলে পরে আর কোন অসুবিধা হয় না। কিন্তু প্রথমেই যদি এটি সঙ্গে সঙ্গে গড়ে না ওঠে তবে শেষ কালে এটি আর নির্মিত হয় না।

বাইরে যে জীবন প্রবাহ চলমান, সেই চিত্র মন্দিরের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হওয়া অবশ্য-কর্তব্য। এটি তাদের অচেতন মনে এমনভাবে দাগ কেটে যাবে যাতে বিচার-ভাবনার কোন অবসর না হয়, এটি তাদের অস্তিত্বের এক অংশ হয়ে যায়। এই কারণে সমস্ত পৃথিবীতে মন্দির ছিল এক অনিবার্য্য ঘটনা—রূপ তার যাই হোক্ না কেন, আকার তার যাই হোক্ না কেন। আজ আমরা যে পৃথিবী গড়ে তুলতে চলেছি সেখানে মন্দির আর কোন অনিবার্য্য বস্তু নয়। অন্য আরও কিছু অনিবার্য্য হয়ে উঠেছে। আজ প্রয়োজন স্কুলের, হাসপাতালের, লাইব্রেরীর তবে এগুলি সবই লৌকিক, ওপারের সঙ্গে, অলৌকিকের সঙ্গে, যা 'বিরহ' তার সঙ্গে এগুলির কোন যোগসূত্র নেই। মন্দির ইশারা করে তারই যা

জীবনকে পরিপূর্ণ করে তোলে, যা জীবনকে অতিক্রম করে কোন এক দূর পারাবারে ইঙ্গিত করে। তাইতো প্রয়োজন ভোরবেলার ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে, চোখ মেলে তাকাবার সঙ্গেই যেন মন্দিরের ঘন্টা ধ্বনি কানে আসে। রাতে ঘুমিয়ে পড়বার সময়ে যেন মন্দিরের ভজন শুনতে শুনতেই ঘুম আসে। আমরা যদি নাও শুনতে পাই তবুও যেন মন্দিরের ভজন কানে আসে।

ছোট্ট এক কাহিনী শুনিয়ে আজকের আলোচনা সমাপ্ত করতে চাই। মহাবীরের জীবনে ঘটেছিল ঘটনাটি। এক চোর মরণাপন্ন হয়ে পড়ছে। মৃত্যুকালে ছেলে যখন জানতে চাইল তার কর্তব্য সম্বন্ধে, তখন সে বলল—একটা কথাই শুধু বলতে চাই এই যে মহাবীর নামের লোকটি, ওর ধারে কাছে কখনও যাবে না। তোমার গ্রামে এসেও যদি কিছু বলে তবে তুমি অন্য গ্রামে পালিয়ে যাবে। যদি সদর রাস্তা দিয়ে যায় তবে তুমি সঙ্গে সঙ্গে কোন এক গলির মধ্যে ঢুকে পড়বে। যদি আশে থেকে খবর না পাও আর তার কথা কানে আসে তবে সঙ্গে সঙ্গে কানে আঙ্গুল দেবে এবং চোখ বন্ধ করে দৌড়ে পালিয়ে যাবে। এই লোকটি থেকে সাবধান। ছেলেটি বলল—কিন্তু এই লোকটির থেকে কিসের এত ভয়? চোর বলল—আমি তোমায় বলছি, আমার কথা মেনে চলো। এই ধরণের লোকের ধারে কাছে গেলে নিজের কাজকারবার বন্ধ হয়ে যাবে, পরে আর বাঁচতে পারবে না। তাই এর থেকে সাবধান। ছেলেটি বাপের কথা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে লাগলো। সব সময়েই দূরে দূরে থাকে। মহাবীর যেখানেই যান, ছেলেটি তাঁর থেকে দূরে পালিয়ে যায়। কিন্তু একদিন ভুল হয়ে গেল। সেদিন রাস্তা ধরে ছেলেটি চলেছে। পাশে এক আম-বাগানে মহাবীর বসে আছেন, এ খবর সে জানত না। মহাবীর চুপ করেই বসেছিলেন, কোন কথা তখন হচ্ছিল না কিন্তু হঠাৎ তিনি বলতে আরম্ভ করলেন আর ছেলেটিও অর্ধবাক্য শুনে ফেলল। এর পরই সে কানে আঙ্গুল দিয়ে, কান বন্ধ করে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু মুস্কিল হোল তার, কেননা, অর্দ্ধেক বাক্য তো সে শুনেই ফেলেছে। এদিকে পুলিসও তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, রাজার লোকজন তাকে ধরবার জন্য চারিদিকে তল্লাসী করছে। একদিন ধরাও পড়লো। ছেলেটি ছিল অদ্ভুত পাকা চোর—পুরুষানুক্রমে এ বিদ্যা সে আয়ত্ব করেছে। এমন অদ্ভুত চুরি যে, কোথাও কোন প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যেত না। রাজার কাছে কোন প্রমাণও ছিল না যদিও সবাই জানতো সেই চোর, সেই চুরি করেছে. কিন্তু প্রমাণ কোথায়ও কিছু নেই। চুরি ব্যাপারে তার কোন লুকোচুরি ছিল না। খবর দিয়েই সে চুরি করতো কিন্তু কোন প্রমাণ পাওয়া যেত না। কাজেই তার নিজের স্বীকৃতি ছাড়া প্রমাণ পাওয়ার আর কোন পথই রইল না। এই কারণে তাকে নেশার দ্বারা গভীর ভাবে আচ্ছন্ন করা হোল। দুই তিন দিন পর্যন্ত তার যাতে কোন হুঁশ না হয় এমনি ভাবে নেশাগ্রস্ত করে রাখা হোল। দু'তিন দিন পরে তার হুঁশ ফিরে এল কিন্তু হুঁশ ফিরে এলেও চোখের দৃষ্টি স্বচ্ছ হোল না। চোখ মেলে তার মনে হোল যেন চারিদিকে অপ্সরা দাঁড়িয়ে রয়েছে। জিজ্ঞাসা করল—আমি কোথায়? বলা হোল তুমি মরে গেছ। তোমাকে স্বর্গে কিংবা নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত করা হচ্ছে। আমরা সবাই তোমাকে নিতে এসেছি। তোমার হুঁশ হোক্ তারই প্রতীক্ষা করছি যাতে তোমায় জিজ্ঞাসা করতে পারি। তুমি জীবনে যে সমস্ত পাপ কার্য করেছ যদি সে সব বলে দাও তবে তোমায় স্বর্গে নিয়ে যাওয়া হবে আর না বললে নরকে যেতে হবে। তাই সত্য বলে যাও, সেইটুকুই যথেষ্ট হবে। একবার তার মনে হোল সত্যই বলে দেয়, স্বর্গে যাওয়ার সুযোগ আর কেন ছেড়ে দিই? যখন মরেই গেছি তখন আর ভয়-কিসের? কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ মহাবীরের সেই অর্ধ-বাক্য তার স্মরণে এল। মহাবীরের নিকট দিয়ে যেদিন সে যাচ্ছিল সেদিন মহাবীর দেবতা এবং প্রেত সম্বন্ধে আলোচনা করছিলেন। মৃত্যুর পরে যমরাজ যেখানে নিয়ে যান তারই ইঙ্গিত ছিল সেই ভাষণে। অর্দ্ধেক বাক্য সে শুনেছিল। মহাবীর বলেছিলেন মৃত্যুর পরে যারা নিতে আসে তাদের পা উল্টো হয়। চোর দেখল তাকে যারা নিতে এসেছে তাদের পা তো সিধে। হঠাৎ সে সজাগ হয়ে উঠল। ভেবে নিল এসব ধড়াচূড়ার ভেতর কে থাকবে বাবা। বুঝতে পারল কিছু একটা গোলমাল কোথাও আছে।

একেবারে সজাগ হয়ে পড়ল, কিছুই আর উত্তর দিল না। বল্‌ল—পাপ তো কিছু করিনি কাজেই বলব টা কি? নরকেই আমায় নিয়ে চলো। আর তাছাড়া আমি যখন কোন পাপ করিনি তখন নরকে নিয়ে যাবেই বা কি করে? এরপর বাধ্য হয়েই তাকে ছেড়ে দিতে হোল। ছাড়া পেয়ে চোরটি সোজা মহাবীরের পায়ে এসে পড়ল আর বলে উঠল, এবার তোমার পুরো বক্তব্য আমায় বলো, অর্ধ বাক্য আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার তোমার সব কথাই আমি শুনতে রাজী। আমি তো শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম। যেতে যেতে একদিন তোমার অর্দ্ধেক কথা আমার কানে আসে তাই আমাকে ফাঁসীর কাঠ-গড়া থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। এবার তোমার বাক্য পুরো করে দাও প্রভু। তা না হলে আমাকে আজ না হলেও কাল আবার ফাঁসীতে লটকে দেবে। আজ আমি তোমার শরণাগত, আমায় আশ্রয় দাও। মহাবীর বলতেন, অর্ধ-বাক্য জোর-জবরদস্তী করেও যদি কানে এসে পড়ে তবে কখনো না কখনো কাজে লেগে যায়। তাই মন্দিরের নিকট দিয়ে যেতে যেতে অকারণেই যদি কখনো মন্দিরের ওঙ্কারিত ধ্বনি, মন্দিরের ভেতরের সুগন্ধ ইন্দ্রিয়গোচর হয়ে পড়ে, তবুও কাজে আসে।　　(সমাপ্ত)

পুনর্জন্মের প্রত্যক্ষ প্রমাণ

অধ্যাপক **প্রণবেন্দু প্রসাদ পাল**

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

শ্রীহট্টে জন্মের কথা জিজ্ঞাসা করায় স্বর্ণলতা আমাকে বলে, তার বাবার নাম রমেশবাবু, মাতার নাম শশীমাতা ছিল। তার নিজের নাম কমলেশ ছিল। অরুণ নামে তার এক ছোট ভাই ছিল এবং মধু নামে এক বন্ধুর কাছে সে নাচ গান শিখেছিল। সে স্কুল যাবার পথে এক মোটর দুর্ঘটনায় পড়ে হাসপাতালে মারা যায়। সে বলে রমেশবাবুর বংশগত পদবী তার মনে নাই। আর বিশেষ কিছু মনে পড়ে না কেবল নিকটে এক বড় নদী এক দেবীর মন্দির ও বড় মাছের বাজার। শ্রীহট্ট এতাবৎ পূর্ব পাকিস্থানে থাকায় সেখানে গিয়ে বিস্তৃত অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় নাই। শ্রীহট্টবাসী কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যাঁরা পশ্চিমবাংলায় চলে এসেছেন তাঁদের নিকট জানতে পারি সিলহেট সহর সুরমা নদীর তীরে, সেখানে মাছের বড় বাজার আছে এবং মাড়োয়ারী পট্টিতে একটি বড় কালীমন্দির আছে। তাঁরা আরও বলেন সেখানে কোন বাঙালী বা অসমীয়া ভদ্রলোকের মোটর গাড়ী ছিল না। মাড়োয়াড়ীদের কারও কারও ছিল। স্বর্ণলতা যে নামগুলি বলেছে সেগুলি মাড়োয়ারী বা গুজরাটি পরিবারের হওয়া সম্ভব। স্বর্ণলতা, তার ভাই কৃষ্ণচন্দ্র ও পিতামাতা সকলের ধারণা যে স্বর্ণলতার গানের ভাষা অসমীয় বা বাংলা মিশ্রিত অসমীয়। মাড়োয়ারী পরিবারের কোন মেয়ের তার বাঙালী বালিকা বান্ধবীর কাছে বাংলা গান শেখার কোন বাধা নাই। সিলহেট সহরে বাঙালীদের প্রাধান্য ছিল। বিয়া বা বিন্দিয়া দেবী বাংলা গান বা মণিপুরী নাচ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিল। এজন্যে স্বর্ণলতা মধ্যপ্রদেশের বাইরে কখনও যায় নাই। নওগাঁ, পান্না বা ছত্তরপুরে সে কোন বাঙালী পরিবারের সঙ্গে পরিচিতা ছিল না। এসব স্থানে বাঙালী অধিবাসী খুবই কম, এবং কোথাও শিখলে তার পিতামাতার তা অজ্ঞাত থাকত না। আমার অনুরোধে স্বর্ণলতা তিনবার আমার সামনে তার নাচ গানের অভিনয় করে যাতে আমি গানের ভাষা লিখে নিতে পারি। দেখলাম নাচ ও গান তার মনে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। একটা বাদ দিয়ে সে অপরটি করতে পারে না। আমি দেখলাম তার গান তিনটিই বাংলা ভাষায়, তার মধ্যে দুটী রবীন্দ্রনাথের, তৃতীয়টি কার লেখা আমি আবিষ্কার করতে পারি নাই। কোন সহৃদয় পাঠকের যদি তৃতীয় গানটি কার লেখা জানা থাকে আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। স্বর্ণলতার নাচের ভঙ্গিমা মণিপুরী শান্তিনিকেতনী ধাঁচের। প্রথম সঙ্গীতটি শান্তিনিকেতনে বসন্ত উৎসবে প্রতি বৎসরই ছাত্রীরা নাচের সঙ্গে গান করে থাকে। আমার

ধারণা স্বর্ণলতা পূর্বজন্মে এমন কোন বান্ধবীর কাছে এই নাচ গান শিখেছিল যে শান্তিনিকেতনী রাবীন্দ্রিক সুর ও মণিপুরী নাচের ভঙ্গিমা আয়ত্ত করেছিল। বিয়ার মৃত্যু হয় ১৯৩৯ সালে, স্বর্ণলতার জন্ম ১৯৪৮ সালে এই ৯ বৎসর ব্যবধান মধ্যে তার আর এক জন্ম ও বালো মৃত্যু অনুমান করা অসম্ভব হবে না। বালো মৃত্যু হওয়ার সম্ভবত সে-জীবনের স্বল্প ঘটনাই তার স্মরণে আছে। এই নয় বৎসর ব্যবধান মধ্যে কোন সময় সে এই নাচ গান আয়ত্ত করে থাকবে। ইং ১৯৬৩ সালে স্বর্ণলতার বয়স ১৪ ছিল, তখনও তার পূর্ব জীবনের স্মৃতি অক্ষুণ্ণ ছিল। এখন আমরা স্বর্ণলতার গাওয়া গান তিনটি পরিবেশন করছি।

রবীন্দ্রকাব্যে যেমন আছে

ওরে গৃহবাসী খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল
স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোল
দ্বার খোল দ্বার খোল
রাঙ্গা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে
রাঙ্গা নেশা মেখে মেশা প্রভাত আকাশে
নবীন পাতায় লাগে রাঙ্গা হিল্লোল
দ্বার খোল দ্বার খোল

পৌষ তোদের ডাক দিয়েছে আয় রে চলে
আয় আয় আয়
ভালা যে তার ভরেছে আজ পাকা ফসলে
মরি হায় হায় হায়
হাওয়ায় নেশায় উঠল মেতে দিগ্‌বধূরা ধানের ক্ষেতে
রোদের সোনা ছড়িয়ে পড়ে মাটীর আঁচলে
মরি হায় হায় হায়
মাঠের বাঁশি শুনে শুনে আকাশ খুসি হোলো
ঘরেতে আজ কে রবে গো খোলো দুয়ার খোলো
আলোয় হাসি উঠল জেগে ধানের শিষে শিশির লেগে
ধরার খুসি ধরে না গো ঐ যে উথলে
মরি হায় হায় হায়

স্বর্ণলতা যেমন গান করে

ওরে গিওবাসী খোল দুয়ার খোল লাগলো যে দোলনা
স্থলে জলে বনতলে লাগলো যে দোলনা
রাঙ্গা হাসি রাশি রাশি আংশুকি পলাশী
রাঙ্গা মেঘে মেঘে মেশা পোয়েসে আকাশী
নবীন পাতায় লাগি নবীন পাতায় লাগি
বন্দে বি দুল্লোল
খুল দুয়ার খুল ওরে গিয়োবাসী
লাগলো যে দোলনা

পোষেতে ডাক দিয়েছে আয়রে ছুটে
আয় আয় আয়
ভালা যি আজ ভরেছি তায় পাকা ফসলে
কি মরি হায় হায় হায়
মাঠে বাঁশি শুনে শুনে আকাশ কেশি হোলো
ঘরেথে মা কে এল বলো
খোলো খোলো দুয়ার খোলো
খোলো দুয়ার খোলো
হাওয়ায় নিশায়;উঠ না মিখেল
দেখবো মোরা ধানের শিষে
রোদে সোনা ছড়িয়ে পড়ে আমিও ছলে
কি মরি হায় হায় হায়

অজ্ঞাত রচয়িতার বসন্তগীতি স্বর্ণলতা যেমন গান করে

তোমরা আয় আয়রে মহুয়া বনে
নুপুর বনে বেনু বাজে কিঁরীত
ঝুমুর ঝুমুর নেচে পাখা পাখা আয়
বনপরি হায়। নূপুর বাজায়
আপনি মনে তোমরা আয় আয়রে মহুয়া বনে
অঙ্গ (অঞ্জ ?) মাখা ঐ আঁখির কোণে।
ফুলের সভায় লাগল পিরীত

এ গানগুলি স্বর্ণলতার এ জীবনে সিনেমা ফিল্ম বা গ্রামোফোন রেকর্ড থেকে শেখা কি সম্ভব ছিল? লওগাঁ, পান্না, ছত্তরপুর বাঙালী বিরল নগর। কোথাও একটীর বেশী সিনেমা হাউস নাই। এবং এসব অঞ্চলে কোন সিনেমা বাঙালা ছবি দেখাবে না—কারণ দর্শকের মধ্যে শতকরা একজনও বাংলা ভাষা বোঝে না। মিশ্রদের বাড়ীতে স্বর্ণলতার ১০।১২ বৎসর বয়স পর্যন্ত কোন গ্রামোফোন বা রেডিও ছিল না। তাছাড়া গ্রামোফোন রেকর্ড হ'তে নাচ শেখা যায় না। সিনেমা ফিল্ম বা গ্রামোফোন রেকর্ড হ'তে স্বর্ণলতা এই গানগুলি শিখলে তার গানের ভাষায় এত ভুল থাকত না এবং ভাষাও এত ওলট পালট হ'ত না। প্রথম দুটী গানের স্বত্ব বিশ্বভারতী কর্তৃক রক্ষিত। তাঁরা কোন ফিল্ম বা গ্রামোফোন কোম্পানীকে এই গান দুটী রেকর্ড করবার অনুমতি দিলেও ভাষাবিকৃতি বা পরিবর্তনে নিশ্চয়ই সম্মতি দিতেন না। বর্ত্তমান জীবনে যখন এ গানগুলি শেখবার কোন সুযোগ ছিল না, কাটনী-মইহর-তিলোরা জীবনেও যখন তা ছিল না—সে অবশ্যই এই দুই জীবনের ব্যবধানে আর এক জীবনে, সে যেমন বলে, শিখে থাকবে, তবে কাটনী সম্বন্ধে নাম স্মরণ করতে প্রথমে যেমন সে কিছু কিছু ভুল করেছিল, সিলহেট জীবনের দেওয়া নাম গুলিতেও কিছু কিছু ভুল থাকা সম্ভব। কাটনী—মইহর—তিলোরা জীবনের কয়েকটি নাম ও ঘটনা প্রথমে তার অস্পষ্ট ছিল, যেমন কাটনীর মহল্লার নাম সে বারকুটীয়া মহল্লা বলেছিল। এই মহল্লার প্রকৃত নাম জব্বাটিকুরিয়া, হরিপ্রসাদ পাঠকের নাম হিরালাল পাঠক বলেছিল এবং শ্রীপাঠকের সঙ্গে তার কি সম্বন্ধ ছিল বলে নাই কেবল বাড়ীর কর্ত্তা বলেছিল, নিজের নাম কমলেশ বলেছিল, বিন্না বা বিন্দিয়া দেবী বলে নাই। সম্ভব সে এক্ষেত্রে কাটনী ও সিলহেটে দুই জন্মের স্মৃতি মিশিয়ে ফেলেছিল। দুই পুত্রের নাম কৃষ্ণ দত্ত ও শিব দত্ত বলেছিল, এক্ষেত্রে দেখা যায় তার পূর্বজন্মের পুত্রদ্বয়ের নামের অর্থ তার স্মৃতিতে নিবদ্ধ ছিল। কৃষ্ণেরই এক নাম মুরলীধর, এবং শিবের এক নাম নরেশ। আমরা যদি এ জীবনে বহু পুরাতন স্মৃতি পুনরুজ্জীবন করতে চেষ্টা করি আমাদের অনেক সময় এরকম স্মৃতিবিভ্রম হয়। কিন্তু সেই সেই লোকের ও স্থানের সংস্পর্শে আসা মাত্রই তার ঠিক ঠিক নাম, সম্বন্ধ ইত্যাদি মনে পড়ে। হরিপ্রসাদ পাঠককে দেখামাত্রই তার ডাক নাম বাবু ও সঙ্গে সঙ্গে নিজের ডাকনাম বিন্না মনে পড়ে। চিন্তামণি পাঠককে দেখামাত্র পূর্বজন্মের স্বামী বলে চিনতে পারে, আর পূর্বজন্মের বড় ছেলেকে দেখা মাত্র তার সঠিক নাম মুরলীধর বলে। তখন আর কৃষ্ণ দত্ত বলে না। কেসটী যদি শেখান সাজান হ'ত এই সকল ভুল ভ্রান্তির অবকাশ থাকত না—প্রথম থেকেই তাকে দিয়ে সব ঠিক ঠিক বলান হ'ত।

এই কেসটিও ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ষ্টিভেনসন পুনঃ পুনঃ বিশদ পর্য্যালোচনা করে সিদ্ধান্তে এসেছেন যে এটী পূর্ব্বজন্মের স্মৃতির একটী উল্লেখযোগ্য ঘটনা (Star Case).

(সমাপ্ত)

আমাদের সুপ্তচৈতন্যে জমা আছে পূর্বাপর সব সংস্কাররাশি—এই নিয়েই আমাদের ব্যক্তিত্ব—এই দিয়েই আমাদের মন—এই সংস্কারের প্রেরণাই আমাদের স্বর্গনরকের নিয়ন্তা—এরই মুক্তিকেই নানা শাস্ত্রে নানা ভাবে করেছে অভিনন্দিত পরম পুরুষার্থ বলে।

—শ্রীশ্রীসত্যানন্দ দেব

বেদ ও অবেস্তা

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

পুরবী পাল এম্. এ, পি-এইচ, ডি

বেদ সাহিত্য, এমনকি চারিটি বেদ সংহিতা এককালীন অথবা কয়েক বৎসরের মধ্যে সৃষ্ট বা রচিত হয় নাই। প্রাচীনতম মন্ত্রগুলি ও প্রাচীন উপনিষদ্ কয়টির মধ্যে ভাষা ও ভাবের দিক থেকে অন্ততঃ দু'হাজার বছরের ব্যবধান অনুমিত হয়। বেদ সাহিত্য আর্য্যজাতির ধর্ম্মীয় ও সামাজিক জীবনের কয়েক হাজার বৎসর ধরে বিবর্ত্তনের ইতিহাস। ঋগ্বেদকে প্রাচীনতম সংহিতা বলে ধরা হয়, কিন্তু এর মধ্যে ঋষিদের বংশধরদের কয়েক শত বৎসরের চিন্তাধারা স্থান পেয়েছে। একেশ্বরবাদ ও সৃষ্টিরহস্য বিষয়ক কিছু কিছু দার্শনিক তত্ত্ব ও জাতকর্ম, বিবাহ, অন্ত্যেষ্টি বিষয়ক সামাজিক ব্যবস্থাও অনুপ্রবেশ করেছে। আবার জনচাহিদায় এর মধ্যেও তাঁরা অল্প কিছু তুক-তাক যাদুমন্ত্রও অথর্ববেদের অনুরূপ সন্নিবেশিত করেছিলেন। ভাষাবিচারে বোঝা যায় এগুলি পরবর্ত্তী কালের যোজনা। অথর্ববেদের অধিকাংশ অবশ্যই অন্য তিনটি বেদ সংহিতার পরবর্ত্তী কালের—কেবল ভাষার দিক থেকে নয়—বিষয়বস্তুর দিক থেকেও এটা স্পষ্ট। যেমন, চতুর্বর্ণের উল্লেখ আমরা ঋগ্বেদে মাত্র একটি সূক্তে (১০,৯০,১২, পুরুষসূক্ত) পাই—তাও মাত্র রূপক আকারে। অথর্ববেদে এই বর্ণভেদের উল্লেখ সামাজিক ব্যবস্থা হিসাবে ব্যাপক আকারে এবং একাধিক স্থলে আমরা পাই। অথর্ববেদে পুরোহিত সম্প্রদায় নিজেদের ব্রাহ্মণরূপে সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর উপরে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং দেবতার সমান ব'লে ঘোষণা করেছেন। তা বলে অথর্ববেদের সব কিছু অন্য তিনটি বেদের পরবর্ত্তী কালের মনে করা ঠিক হবে না। ঋক্, সাম, যজুস, যেমন অভিজাত সম্প্রদায়ের যাগ যজ্ঞ, পূজা, উপাসনার বেদ, অথর্ববেদ তেমনি সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ায় জনসাধারণের আশা আকাঙ্ক্ষা, কামনা পূরণের, এক কথায় অভীষ্ট লাভের বেদ। এর এক বৃহৎ অংশ ঝাড় ফুঁক, তুক-তাক, মারণ উচাটন, অভিচার বিষয়ক মন্ত্রের সঙ্কলন, যা এক আদিম অতীতের সাক্ষ্য দিতেছে।

এরকম মনে করা ভুল হ'বে যে, প্রাচীন আর্য্যরা কেবল এক ঋষি শ্রেণী ছিলেন। এই জাতির কোন অংশ অবশ্যই যুদ্ধ, পশুশিকার,, কৃষিকর্ম ও বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন, যারা উত্তরকালে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নামে চিহ্নিত হয়েছিলেন এবং এরা সকলেই নিজ নিজ কাজে চারিপাশের কিছু কিছু আর্য্যেতর জনগণকে নিযুক্ত করতেন, যাদের তাঁরা দাস নামে অভিহিত করতেন এবং যাঁরা পরবর্ত্তী কালে শূদ্র শ্রেণীভুক্ত হ'ন। শেষোক্ত শ্রেণীর অনেকেই ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ করাতে অক্ষম ছিলেন এবং এঁদের চাহিদায় এঁদের মধ্যে কিছু কিছু চতুর লোক তুক-তাক, ঝাড়-ফুঁক, যাদু প্রভৃতি অভীষ্ট লাভের সংক্ষিপ্ত প্রক্রিয়ার প্রচলন করেন।

অথর্ববেদের তুক-তাক্ যাদুমন্ত্রের বিষয়বস্তুর কিছু আভাস দেওয়া যাক, যেমন বুধ্নমোচনম্। যক্ষ্মনাশনম্, জ্বরনাশনম্, কিলিনাশনম্, শ্বেতকুষ্ঠনাশনম্ ইত্যাদি প্রতি রোগের-কারক কোন পিশাচ বা দানব অনুমিত হয়েছে, যেমন জ্বরের কারক দানব তক্মন। মন্ত্রগুলির উদ্দেশ্য এই সমস্ত পিশাচ, রাক্ষস, দানব, অপ্সরা, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দুষ্ট অপদেবতার বিতাড়ন। সেইসঙ্গে কতকগুলি ভেষজের গুণাগুণও বর্ণিত হয়েছে। আবার আমরা পাই যুদ্ধজয়ের (অ ১।৯), শত্রুসেনা সম্মোহনের (৩।১), সর্পভয়, অগ্নিভয় নিবারণের মন্ত্র, নারীর পুরুষকে বশীকরণের মন্ত্র (অথর্ব ৬, ১৩০, ১৩৭), পুরুষের নারীকে বশীকরণের মন্ত্র (অ ৩,২৫), কোন নারীর প্রতিদ্বন্দ্বী অপর নারীকে যমালয়ে প্রেরণের মন্ত্র (অ ১,১৭), বিদ্বেষবশতঃ অপর নারীকে বন্ধ্যাকরণের মন্ত্র (অ ৭,৩৫); মাদুলিবিশেষের গুণপ্রশস্তি (অ ১০, ৩)।

এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপকারী পুরোহিত শ্রেণী ছিলেন অন্ধকের দিনের গ্রাম্য ওঝাদের সমগোত্রীয়। স্বভাবতঃই সামাজিক মর্যাদায় এই শ্রেণীর পুরোহিতের স্থান ছিল অপর তিনটি বেদোক্ত যজ্ঞকারী পুরোহিত শ্রেণীর নীচে। এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপ যে অপর পুরোহিত গোষ্ঠী সুনজরে দেখতেন না তার প্রমাণ আমরা পাই এই চতুর্থ বেদটিকে দীর্ঘকাল যাবৎ বেদ বলে স্বীকার করতে অসম্মতিতে। বুদ্ধদেবের সময় পর্য্যন্ত প্রাচীন সাহিত্যে আমরা ঋক, সাম, যজুস্ এই তিনটি সংহিতার বেদ বলে উল্লেখ পাই 'ত্রয়ী বিদ্যা' রূপে। চতুর্থটির উল্লেখ কেবল অথর্বাঙ্গিরস :— অর্থাৎ অথর্বন্ ও অঙ্গিরাদের মন্ত্রতন্ত্র—অথর্বন ও অঙ্গিরস প্রাগৈতিহাসিক যুগের দুই ঋষির নাম—এই অর্থে অথর্বন শব্দটি অবেস্তাতেও ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে তাদের বা তাদের বংশধরদের প্রবর্ত্তিত যাদুমন্ত্র সম্বন্ধে এই দুই শব্দের ব্যবহার দেখা যায়—'শৌষ্টকানি' 'আয়ুষ্টানি' প্রভৃতি শুভফলপ্রদ যাদুমন্ত্রগুলি অথর্বন নামে এবং হানিকর ও অশুভ ফলপ্রদ যাদুমন্ত্রগুলি 'আভিচারাণী' অঙ্গিরা নামে আখ্যাত হয়। ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও অথর্বন্‌কে (১।৮৩।৫, ১০।১৪।৬) ও অঙ্গিরসকে (১।৭১।১, ১।৬২।৩, ১০।১৪।৬) সুদূর অতীতের পিতৃগণ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে এই যাদুমন্ত্র গুলির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে আমরা অনুমান করতে পারি। আবার এমনও হতে পারে যে, অথর্ববেদের প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠাকল্পে এই দুই নামের আশ্রয় লওয়া হয়েছে। পরবর্ত্তীকালে কৌশিকসূত্রে এই সমস্ত যাদুমন্ত্র অনেকাংশে রক্ষিত হয়েছে। অনুরূপ যাদুমন্ত্র ও যাদুক্রিয়াকলাপ পৃথিবীর সর্ব্বত্র আদিম অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং এখনও কিছু কিছু আছে—যেমন প্রাচীন সুমেরীয় ও আসিরীয়দের, গ্রীক, রোমান ও টিউটনদের (প্রাচীন জার্মান) মধ্যে উত্তর আমেরিকার আলাস্কার টিলিনগিতদের ও আফ্রিকার নিগ্রোদের মধ্যে। অথর্ববেদে সঙ্কলিত যাদুমন্ত্রের সব কিছুই ভারতে জাত এমন নাও হ'তে পারে—এগুলির মধ্যে আর্য্যজাতির মেরু অঞ্চল থেকে ভারতে পরিক্রমাকালীন বিভিন্ন আদিম জাতির সংস্পর্শে আসার সুযোগে তাদের মধ্যে প্রচলিত কিছু কিছু যাদুমন্ত্রসংগ্রহ থাকা সম্ভব। কারণ, দেখা যায় এই সমস্ত যাদুর কিছু কিছু প্রাচীন জার্মান জাতির ও মধ্যপ্রাচ্যের ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের আদিম যাদুমন্ত্রের সমগোত্রীয়। এই পুরোহিত গোষ্ঠি তাদের মন্ত্র-তন্ত্র সঙ্কলনকে চতুর্থবেদ পর্য্যায়ে উন্নীত করবার জন্য বিশেষ প্রয়াস পান। ঋগ্বেদ সংহিতার অনেকগুলি উচ্চাঙ্গের ঋক তাঁরা হুবহু অথর্ববেদের সঙ্কলনভুক্ত করেন—যেমন, অথর্ববেদের শেষ কাণ্ডের (বিংশ কাণ্ডের) মন্ত্রের প্রায় সবগুলিই ঋগ্বেদ থেকে গৃহীত। অথর্ববেদের প্রায় এক সপ্তমাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদের আবার এই মন্ত্রগুলির প্রায় অর্দ্ধেক ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ঋক্, বাকী অর্দ্ধেক ঋগ্বেদের প্রথম ও অষ্টম মণ্ডলের ঋক। বিদগ্ধ পণ্ডিত সমাজের বিচারে ঋগ্বেদের দ্বিতীয় হ'তে সপ্তম মণ্ডল প্রাচীনতম অংশ, প্রথম ও অষ্টম মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী যুগের রচনা এবং দশম মণ্ডল সর্ব্বশেষ পর্য্যায়ের রচনা। একই উচ্ছ্বাসে কয়েক সূক্তে সৃষ্টিতত্ত্বের এবং অন্য বেদ সংহিতার অনুকরণে দার্শনিকতত্ত্বের অবতারণা করা হয়, যার অংশবিশেষকে জার্মান অধ্যাপক উইনটারনিৎস (M. Winternitz) Pseudo Philosophy, mystery mongering, mystical humbug বলে অভিহিত করেছেন। অবশেষে কালক্রমে তাঁরা তাঁদের অথর্বাঙ্গিরস শাস্ত্রের বেদরূপে স্বীকৃতি লাভে সফল হন। অথর্ববেদ সংহিতায় কবিপ্রতিভার কোন নিদর্শন নেই মনে করা ভুল হ'বে। এই গ্রন্থের কতক সূক্ত (অ ৪।১৬), ভূমিসূক্ত (অ ১২।১) ও আরও কয়েকটি ছোটখাট সূক্ত ভাষা ও ভাবের সৌন্দর্য্যে পৃথিবীর পণ্ডিত সমাজের প্রশংসা অর্জ্জন করেছে। চারটি বেদসংহিতার মধ্যে অথর্ববেদেই আমরা পূর্বভারতের পাহাড় জঙ্গলের পশুরাজ ব্যাঘ্রের উল্লেখ পাই। এটাও এই বেদের কনিষ্ঠতার পরিচায়ক। এই বেদের অংশবিশেষ রচিত হয়েছিল আর্য্যজাতির পূর্বভারতের সঙ্গে পরিচিতির পর। অথর্ববেদের আর একটি বৈশিষ্ট্য পঞ্চদশ মণ্ডলে ব্রাত্যদের প্রশস্তি। ব্রাত্যকে বলা হয়েছে মনুষ্যশ্রেষ্ঠ এবং দেবতাদের মধ্যে মহাদেবের সম। এই ব্রাত্য কারা? আর্য্যেতর কোন সম্প্রদায় না আর্য্যদের মধ্যে বৈদিক ক্রিয়াহীন পতিত কোন শ্রেণী? এ বিষয়ে পণ্ডিতমণ্ডলী কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেন নাই। অথর্ববেদে ব্রাত্যদের প্রশংসা থেকে অনুমান করা অন্যায় হবে না যে অথর্ববেদ মুখ্যতঃ ব্রাত্যদের বেদ ছিল। এরূপ অনুমানও অসঙ্গত হবে না যে

অপর তিন বেদধারী পুরোহিত গোষ্ঠি অথর্ববেদধারী পুরোহিত গোষ্ঠিকে হীন চক্ষে দেখতেন এবং তাদের অথর্বাঙ্গিরস শাস্ত্রকে বেদের মর্যাদা দিতে বহুকাল পরাঙ্মুখ ছিলেন। এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে অথর্বাঙ্গিরস পুরোহিত গোষ্ঠি তাদের গ্রন্থকে ব্রহ্মবেদ নাম দিয়ে অপর তিনটি বেদসংহিতার উপরে স্থান দেবার চেষ্টা করেছিলেন। ব্রহ্মবেদ তিনটির যে কোন অর্থে প্রযুক্ত হয়ে থাকতে পারে (১) যজ্ঞের তত্ত্বাবধায়ক ব্রাহ্মণ আখ্যাধারী পুরোহিতের বেদ। কিন্তু এই ব্রাহ্মণ আখ্যাধারী তত্ত্বাবধায়কের অথর্ববেদ অপেক্ষা অপর তিনটি বেদ বিষয়ে অভিজ্ঞ হওয়াই অধিকতর প্রয়োজন ছিল। অথর্ববেদে এমন কিছু নাই যাতে একে যজ্ঞের 'তত্ত্বাবধায়কের' বেদ বলা চলে। ২) বৈদিক মন্ত্রকে ব্রাহ্মণ সাহিত্যের কোথাও কোথাও ব্রহ্মন্ নামে অভিহিত করা হয়েছে। এই সংজ্ঞা ব্রহ্মার দ্যোতক। অথর্ববেদের তুকতাক যাদুমন্ত্র সম্বন্ধে এর প্রয়োগ অসঙ্গত মনে হয়। ৩) ব্রহ্মবিদ্যার প্রবর্তক বা আধার এই অর্থেও অথর্ববেদের এই সংজ্ঞা সমীচীন মনে হয় না। কাজেই কোন অর্থেই অথর্ববেদের ব্রহ্মবেদ সংজ্ঞা উপযোগী নয়। অথর্ববেদের জগৎ ঋগ্বেদের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। ঋগ্বেদের ঋকগুলিতে দেবতাদের প্রতি কবি ঋষির স্বতঃস্ফূর্ত বিস্ময়, শ্রদ্ধা, অনুনয়, প্রার্থনা নিবেদন এবং স্তুতিগুণ বাচনার আমরা সম্মুখীন। ঋগ্বেদের দেবতারা শুভফলপ্রদ এবং উপাসকের বাঞ্ছাপূরণকারী এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর অধীশ্বর। অথর্ববেদে পিশাচ, দানব, যক্ষ, গন্ধর্ব, অপ্সরা অধ্যুষিত এক রহস্যের রাজত্বের আমরা সম্মুখীন। মানুষ এই সমস্ত অপদেবতাকৃত অনিষ্টের হাত থেকে নিজেদের রক্ষা করতে নানা কৌশল ও অপকৌশল নিয়ে ব্যস্ত, আবার এদের সাহায্যে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বীর অনিষ্ট সাধনেও উদ্যোগী। ঋগ্বেদের দেবতাদের—ইন্দ্র, বরুণ, রুদ্র প্রভৃতির উল্লেখ মাঝে মাঝে থাকলেও তাঁরা অথর্ববেদে তাঁদের বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছেন এবং ঋগ্বেদের দেবতাদের ছায়া মাত্র।

(ক্রমশঃ)

প্রাথমিক শিক্ষা—রাজ্যে রাজ্যে

সুদর্শন বিশ্বাস, এম. এ., বি. টি,

সংবিধানিক শর্তানুসারে ১৪-বৎসর পর্যন্ত বালক-বালিকাদের জন্য অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার ব্যবস্থা করা ভারত-সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব আজ পর্যন্ত কতটুকু কাজে পরিণত হয়েছে—তার হিসাব আমাদের রাখা দরকার।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নিম্ন-প্রাথমিক (১ম—৫ম শ্রেণী পর্যন্ত—৬-১১ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য) ও উচ্চ প্রাথমিক। ৬ষ্ঠ—৮ম শ্রেণী পর্যন্ত—১১-১৪ বৎসরের বালক-বালিকাদের জন্য) পর্যায়ের শিক্ষা-ব্যবস্থার হিসাব নিকাশ নিলে দেখা যায়—বর্তমানে সব রাজ্য ও কেন্দ্র-শাসিত অঞ্চলেই নিম্ন প্রাথমিক পর্যন্ত অবৈতনিক শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত বাধ্যতামূলক স্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয় নি। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত ভারতের অন্যত্র উচ্চ-প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষা বর্তমানে অবৈতনিক। বিহার, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গে এই পর্যায়ের শিক্ষা অবৈতনিক কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য। সংবিধান শর্ত পূরণের জন্য এই স্তরের বাধ্যতামূলক শিক্ষা ব্যবস্থা এখনও অনেক—অনেক দূরে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য, অন্ধ্রপ্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীর, কেরালা, কর্ণাটক, নাগাল্যাণ্ড এবং তামিলনাড়ু—এই কটি রাজ্যে বর্তমানে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক। রাজস্থান ও উত্তরপ্রদেশে কেবলমাত্র বালিকাদের জন্য এই স্তরের শিক্ষা অবৈতনিক করা সম্ভব হয়েছে।

(নিম্ন) প্রাথমিক শিক্ষা ভারতের রাজ্যে রাজ্যে কিরূপ বিস্তৃতি লাভ করেছে এবং রাজ্যগুলিতে বিগত তিনটি আদম শুমারীর গণনানুযায়ী শিক্ষিতের হার কিরূপ—তার একটি চিত্র কিছু সংখ্যাতত্ত্বের মাধ্যমে আমরা পেতে পারি। চিত্রটি ১৯৬৬-৬৭ সালের। চিত্রটি কয়েক বৎসর পূর্বের হলেও রাজ্যগুলির (কয়েকটি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল সহ) প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থা মোটামুটি ঐরূপই আছে।

এই ছকের অধিকাংশ সংখ্যাই কেন্দ্রীয় সরকার প্রদর্শিত Statistical Abstract India—1970—পুস্তিকা হ'তে গৃহীত হয়েছে।

রাজ্য	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	শিক্ষার্থী সংখ্যা (লাখে)	শিক্ষক সংখ্যা		প্রত্যক্ষ ব্যয় (কোটিতে)	শিক্ষিতের হার (%)		
			শিক্ষণ প্রাপ্ত	অশিক্ষণ প্রাপ্ত			১৯৬১	
অন্ধ্রপ্রদেশ	৩৬,৯০৬	৩৮'৫৯	৯০,১৮৮	৭,২৫৩	১২'১০		২৪'৬	
আসাম	১৯,৪২৯	১৪'৭৭	২১,৩০৭	১৪,৯৯৩	৫'৪২		৩৩'০	
বিহার	৪৫,২৯৭	৪০'১৪	৭৫,৭৬২	২২,৮২৩	৬'১৯		২১ ৮	
গুজরাট	১১,১৫৭	২৪ ৬৪	৩৯,৩৮০	১৯,২৩২	৩'৮১		৩৬ ২	
হরিয়ানা	৪,৪৪৭	৪'১১	১৮,৩৬৩	৪০১	১ ৮৮	—	২৪'১	
হিমাচল প্রদেশ	৩,৫২১	৩ ৬৩	৯,১৮০	১,৭৫০	১'৪০		২৪'৬	
জম্মু ও কাশ্মীর	৪,৫০১	৩ ১৯	২,৭৮২	৩,৩১৬	'৯০	—	১৩'০	
কেরালা	৬,৯৩৫	২৫'৭৩	৬৩,২৭৪	৩,১৭৪	৯'১০	৪০'৭	৫৫'১	
মধ্যপ্রদেশ	৩৫,৫৭৮	২৯ ২৪	৭১,৩৯১	১৬,২৪৬	১২'৬২	৯ ৮	২০'৫	
মহারাষ্ট্র	২৮,৮৩২	৪৭ ০১	৮২,৬৯২	২২,৩৭৬	১১'৫৩	২০'৯	৩৫'১	
কর্ণাটক	২১,৪৭০	২৯'৫০	৪০,৭১৬	২৩,১২৫	৪'৯৩	১৯ ৩	২৯'৮	
নাগাল্যাণ্ড	৭৮৪	'৫৭	৪৩৬	২,২২৭	'৪৪	১০'৪	২০'৪	
উড়িষ্যা		১৮'৪২	৩৩,৫৮৬	২০,৬১৫	৫'৭৩	১৫'৮	২৫'২	
পাঞ্জাব		১৩'০১	৩১,২১৩	১,১৪৮	৩'৯২	১৫'২	৩১ ৫	
রাজস্থান	১২,১৬১		৩৭,২০৭	১২,০৫২		৮'৯	১৮'১	
তামিল নাড়ু	২৫,০২১		১,২১,৬৮১	১,১৭৮			৩৬'৪	
উত্তর প্রদেশ	৬০,২৪৩		১,০০,৮২৬	৭৪,৫১৬				
পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,১২০		৫১,০৪০	৬৮,৩২৩	২৪'০	২৫'৩	৩৩'২০	
ত্রিপুরা	১,৪১০		১,৮৯৩	২,২৫২	১৫'৫	২৪'৩	৩০'৪৮	
মনিপুর	২,১১০		১,০৮৭	৫,৪০০	১১'৪	৩৬'০	৩২'৯১	
দিল্লী (১)	৯৩৪		১২,৪৫৪	২৩	৩৮'৪	৬২'০	৬৩'৭১	
নেফা (১)	৪১০		১৬০	৫০০	—	৮ ৬	—	
পণ্ডিচেরী (১)	২৩৮			৩৩৬	—	৪৩'৭	৪৬'০২	

(১) কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

স্বামী শিবানন্দ

শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজ, আমাদের প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় শন্টু মহারাজ, ১৯১০ খৃঃ বর্তমান বাংলাদেশের যশোহর জেলার ইছিনা গ্রামের সম্ভ্রান্ত সেন পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺মনোমোহন সেন মহাশয় তাঁর স্নেহপ্রবণ মন ও মিষ্ট স্বভাবের জন্য গ্রামবাসী ও আত্মীয় পরিজনের অতি প্রিয় ছিলেন। ধর্মপ্রাণা স্নেহময়ী মাতা ৺কিরণশশী দেবীর উদার অন্তঃকরণ দুঃস্থ দারিদ্রপীড়নের সেবার জন্য থাকত সদা ব্যাকুল। জীবনসায়াহ্নে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ দেবের কাছে আতুর সন্ন্যাস গ্রহণ করে কাশীধামে দেহত্যাগ করেন। শিবানন্দজীর জ্যেষ্ঠা ভগিনী সন্ন্যাসিনী স্নেহপুরী মাতাও ছিলেন শ্রীঠাকুরেরই দীক্ষিতা সন্তান। তাঁর ভাগিনেয় স্নেহপুরী মাতাজীর সুযোগ্য পুত্র সারদা বিহারের শ্রীমৎ স্বামী নচিকেতসানন্দজীও ঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত সন্তান। নচিকেতসানন্দজীর তিনি ছিলেন প্রিয় 'মণিমামা'। ঠাকুরও তাঁকে আদর করে 'মণিমামা' বলে ডাকতেন মাঝে মাঝে।

কলকাতার স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে আই. এ, এবং বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে বি. এ. পাশ করে কিছুকাল চাকুরী জীবন যাপনের পর শিবানন্দজীর, পূর্বাশ্রমের শ্রীশম্ভুচন্দ্র সেনের বিষয়বিমুখ মন সংসার বন্ধন ছিন্ন করে পরম পাওয়ার আকুলতায় ত্যাগের পথে করল ব্যাকুল যাত্রা। শ্রীশ্রীঠাকুরের কাছে দীক্ষা লাভ করে হিমালয়ের ও ভারতের নানা তীর্থ পথে পরিভ্রমণ করে বহু মহাপুরুষ ও সাধুসন্তের পূতসঙ্গে এবং কিছুকাল আনন্দময়ী মার দিব্যসান্নিধ্যে কাটিয়ে ঘরের ছেলে শেষে ঘরে ফিরে আসেন শ্রীঠাকুরের চরণপ্রান্তে। বহু সাধু মহাত্মার সংস্পর্শে এবং নানা স্থান ভ্রমণে জীবনে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন। এবং তারই ফলে আমাদের ঠাকুর সম্বন্ধে প্রাণের উপলব্ধিতে সরলদৃঢ় কণ্ঠে একদিন বলেছিলেন আমাকে—বহু বড় বড় মহাপুরুষ দর্শন করেছি, তাঁদের সঙ্গলাভ করেছি, সেবা করেছি কিন্তু এমন মহাপুরুষ আর দ্বিতীয় দেখি নি, এমন তপস্যা কোথাও দেখলুম না, এমন রূপময় প্রেমময় পুরুষের সাক্ষাৎ আর কোথাও পাইনি।

সেই প্রেমের বাঁধনে তিনি এমন বাঁধা পড়লেন যে, শেষ ১০।১১ বছর ঠাকুরের চরণ ছেড়ে আর কোথাও নড়েন নি। নিয়মিত ধ্যানধারণা সাধন ভজনের সঙ্গে স্বাধ্যায়ও ছিল তাঁর সাধন অঙ্গ প্রাণের বস্তু, ফলে অগাধ শাস্ত্রজ্ঞান তিনি লাভ করেছিলেন। লেখক, কবি এবং বক্তা হিসেবেও তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আশ্রম মুখপত্র ভাবমুখের সম্পাদনার দায়িত্বও কিছুকাল বহন করেন।

এ প্রসঙ্গে মনে পড়ছে এক অতীত দিনের কথা। ১৯৬৫ সাল। দুবরাজপুরে কাত্যায়নী উৎসব উপলক্ষে শ্রীঠাকুরের শুভাগমন হয়েছে। শ্রীঠাকুরকে দর্শন ও উৎসবে যোগদানের জন্য আমিও হয়েছি উপস্থিত। হঠাৎ একদিন আমার ঘরে এক কমণ্ডলুধারী সাধু প্রবেশ করলেন, পাতলেন তাঁর আসন। প্রথমে গম্ভীর মনে হলেও পরে তাঁর অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হলুম—অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি হয়ে গেলেন আপনজন। তাঁর আসনের ওপর পড়ে থাকা "আনন্দ-বার্তা" পত্রিকাটী নিয়ে পড়তে পড়তে বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধে তাঁর একটি প্রবন্ধ আমাকে খুব আকর্ষণ করল। বললাম বড় চমৎকার লেখার হাত তো আপনার। 'ভাবমুখে'তে লেখেন না কেন? তাঁর সম্বন্ধে তখন জানতাম না কিছুই। ভাবমুখেতে যে একদিন বহু লিখেছেন সে খবর আমার জানা ছিল না। আশ্চর্য। নিজমুখে আর প্রকাশ করলেন না সে-কথা, শুধু বললেন—লিখব। সেটাই আমার তাঁর সঙ্গে প্রথম পরিচয়। আজ আর তিনি আমাদের মধ্যে নেই। বারে বারে মনে পড়ে তাঁর সেই স্মৃতি। তীর্থে তীর্থে জপধ্যান তপস্যায় কেটেছে দিন। তাই ভাবমুখেতে লেখা ছিল দীর্ঘ দিন বন্ধ। যাইহোক, আমার অনুরোধ তিনি রেখেছিলেন। তারপর থেকেই ভাবমুখের পাতায় আবার দেখি শিবানন্দজীর দীপ্ত বিকাশ—বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর রচিত সারগর্ভ রচনার ভাস্বর প্রকাশ। ধর্ম ও দর্শন ভিত্তিক এবং আমাদের ঠাকুরের জীবনবেদ অবলম্বনে তাঁর জ্ঞানগর্ভ বহু প্রবন্ধ ও ভাবসমৃদ্ধ কবিতা ভাবমুখে প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকার ধারাবাহিক

ভাবে প্রকাশিত "পরলোক ও পুনর্জন্ম প্রসঙ্গে স্বামী অভেদানন্দ" শীর্ষক প্রবন্ধটীতে তাঁর গভীর মননশীলতা ও দার্শনিক চিন্তার ছাপ অতি উজ্জ্বল। তাঁর জীবনের আর একটি আদর্শ দিক ছিল শিক্ষকতার দিক। তিনি ছিলেন আদর্শ শিক্ষক। প্রতিটী ছাত্রছাত্রীর শিক্ষার বিষয়ে তিনি বিশেষ যত্ন নিতেন। তাদের সকলের সঙ্গে ছিল তাঁর সরলতরা স্নেহসিক্ত মধুর ব্যবহার। প্রত্যেকের কল্যাণ কামনা ছিল তাঁর নিত্য কৃত্য। যখনই কেউ রোগে শোকে দুঃখে বিপদে কাতর হয়ে তাঁর কাছে এসে ঠাকুরের কৃপা প্রার্থনা করেছে তিনি তাদের মঙ্গলার্থে হোম করেছেন, গভীর রাতে জপ নিবেদন করে প্রার্থনা জানিয়েছেন ঠাকুরের চরণে।

শিবানন্দজীর দেহান্তে আমরা শ্রীঠাকুরের বিশেষ কৃপাপ্রাপ্ত মানবসেবী, কর্তব্যনিষ্ঠ ও মধুর স্বভাবের এক উচ্চ-স্তরের সাধককেই হারালাম।

সেই জ্ঞানতপস্বী সাধকের স্মৃতির উদ্দেশ্যে ওরা মার্চ সকালে আশ্রমে ভাণ্ডারা উৎসব উপলক্ষে নাটমন্দিরে সঙ্ঘপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে একটি স্মৃতিসভার আয়োজন হয়েছিল। সভায় স্বামী বিবি-দিষানন্দ মহারাজ, স্বামী নচিকেতানন্দজী, ব্রঃ ব্রত চৈতন্য এবং বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ শ্রীহরিপ্রসাদ সেনগুপ্ত তাঁর পূত জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনার মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি দেন স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দজী। শিবানন্দজীর রচনা থেকেও অংশ বিশেষ পঠিত হয়। সঙ্ঘপতি শ্রীমৎ স্বামী নির্বেদানন্দ মহারাজজী স্মৃতিতর্পণ প্রসঙ্গে যা বলেন স্বামী শঙ্করানন্দ মহারাজের স্মৃতিলিপন থেকে সেটা এখানে উদ্ধৃত করছি—

"আমাদের বড় আদরের শম্বু, স্বামী শিবানন্দ দীর্ঘ রোগভোগের পর আজ ত্রয়োদশ দিবস হল দেহরক্ষা করেছে। গঙ্গাতীরে মণিমন্দির ঘাটে তার শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে।

শম্বু মহারাজ ঠাকুরের কাছে দীক্ষা গ্রহণ ক'রে এই আশ্রমে প্রথম দিকে কাটিয়ে আশ্রম মুখপত্র ভাবমুখের ভার নেয়। তারপর প্রব্রজ্যায় যায়। ফিরে এসে আনন্দময়ী মায়ের সঙ্গে থাকে। আবার নানা তীর্থ ভ্রমণ করে আজ থেকে ১১ বছর পূর্বে আনন্দময়ী মায়ের অনুমতিক্রমে এই আশ্রমে আবার ফিরে আসে এবং এখানেই থাকে। এই সময় একদিন শম্বু মহারাজ ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানায়, ঠাকুর, এক জ্যোতিষী বলেছেন—এই বৎসরই আমার মৃত্যুযোগ আছে। আমি এখনও প্রস্তুত হইনি, কৃপা করে আমায় আর ১০ বছর পরমায়ু দিন। একথা শুনে ঠাকুর হেসে বলেন, "মা ও ঠাকুর যদি কৃপা করেন তবে তাই হবে।" তারপর থেকে এখানেই থাকে। তার প্রিয় জিনিষ ছিল স্বাধ্যায় ও আধ্যাত্মিক আলোচনা। জপধ্যান ছাড়াও স্বাধ্যায় ও পড়াশুনার ফলে তার বহু লেখা ভাবমুখে প্রকাশিত হয়েছে।

আশ্চর্য। ঠাকুরের কাছে যেদিন পরমায়ু প্রার্থনা করেছিল সেদিন থেকে ঠিক ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। তাকে যখন হাসপাতালে ভর্তী করতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন চোখের জলে মণিমন্দির, শ্রীমন্দির ও ঠাকুর মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে প্রার্থনা করে যায়—"ঠাকুর, আমি যেন ফিরে আসতে পারি।" দু' আড়াই মাস পর হাসপাতাল থেকে যখন ছাড়া হ'ল তার ভগ্নী মহামায়া মা শম্বু মহারাজকে তাঁর কাছে রেখে সেবা করার আগ্রহ আমার কাছে টেলিফোনে প্রকাশ করেন। আমি সম্মতি জানাই। ভগ্নীর সেবায় এবং কবিরাজ শ্রীনারায়ণ চন্দ্র দে মহাশয়ের সুচিকিৎসায় কিছুটা ভাল হওয়ার পর গত শারদীয়া সপ্তমী পূজার দিন সকালবেলা আশ্রমে এসে সব মন্দিরে প্রণাম জানিয়ে এবং আশ্রমে কিছুক্ষণ থেকে আবার ফিরে যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ রোগ পুনরায় বৃদ্ধির দিকে যায় এবং ১৯শে ফেব্রুয়ারী দেহান্তের পর তার মরদেহ সাধুদের দ্বারা বাহিত হয়ে আশ্রমে প্রথমে মণিমন্দির প্রাঙ্গণে নীত হয় এবং শান্ত্যাদি পাঠ, নামকীর্তন ও হোমাগ্ন্যাদি সাধনে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের পর মণিমন্দির ঘাটে তার শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।"

সর্বশেষে শম্বু মহারাজের দিব্যজীবন অবলম্বনে শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের রচিত একটি কবিতা আবৃত্তি করে স্মৃতিতর্পন সম্পন্ন করলেন সঙ্ঘপতি। এই সঙ্গে আমারও প্রণাম জানাই সেই আদর্শ সন্ন্যাসীকে। —স্বামী বীরানন্দ

আমাদের ঠাকুরের জন্মোৎসব

স্বামী সুপর্ণানন্দ

বরাহনগর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে যুগপুরুষ শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের চতুঃসপ্ততিতম শুভ জন্মোৎসব পালিত হ'ল বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। ছোব্বিশে ফেব্রুয়ারী সকালে শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের কাশীপুরস্থ পূর্বাশ্রম ভবনে সাধু ও ভক্তবৃন্দ কর্তৃক পূজা ও নাম কীর্তন অনুষ্ঠিত হ'ল। বৈকালে আশ্রম প্রাঙ্গণ হ'য়ে উঠলো শিশুদের মিলন তীর্থ। এই সম্মেলনে শিশুরা তাদের প্রিয় বন্ধু শ্রীপার্থ ঘোষকে পেয়েছিল প্রধান অতিথিরূপে। তাঁর উপস্থিতিতে শিশুমেলা খুব জমে ওঠে। শিশুরা যা বলে তাই ভাল, যা করে তাই ভাল। ছোট্ট ছোট্ট গোপাল গোপালির দল অনেক কিছুই পরিবেশন করল সেদিন। তাদের আবৃত্তি গান নাচ ছড়া ইত্যাদি সবই খুব মিষ্টি লেগেছিল উঠোনভরা শিশুদর্শকদের এবং তাদের সাথে বড়দেরও। শ্রীপার্থ ঘোষ একটা গল্পের মাধ্যমে শিশুদের বললেন, "ইতিহাসকে ভুললে আমরা এক পাও এগোতে পারবো না।...এই আশ্রমের মত এমন একটি তীর্থ রয়েছে এখানে কিন্তু এর গৌরব আমরা রাখিনা। আমাদের হাতের কাছেই এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান। এখানে এসে আমরা শান্তি এবং পবিত্রতা লাভ করতে পারি।" শিশু সম্মেলন পরিচালনা করেন স্বামী অরূপানন্দ এবং সহযোগিতা করেন স্বামী মধুরানন্দ।

ঐ দিন সন্ধ্যায় আশ্রমে সত্যানন্দ প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দজী। এই প্রদর্শনীর প্রধান শিল্পী হ'লেন ব্রহ্মচারী শঙ্কর চৈতন্য। তাঁর সহযোগী ছিলেন শ্রীশিমুল ঘোষ এবং শ্রীশ্যামসুন্দর দোষ। শঙ্করদার তুলিতে অপরূপ রূপে ফুটে ওঠে শ্রীঠাকুরের কয়েকটি সুন্দর লীলাচিত্র। এছাড়া কিছু অন্য চিত্রও তাঁর বিশেষ শিল্প প্রতিভার প্রমাণ স্বরূপ রাখা হয়েছিল প্রদর্শনীতে। শ্রীঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ব্রহ্মচারী শঙ্করের তুলি যে গভীর মৌলিক অন্তর্দৃষ্টির পরিচায়ক সে বিষয়ে কোনও দ্বিমত নেই। তরুণ শিল্পী শিমুলের কয়েকটি ছবি তার শিল্প দক্ষতার বিশেষ পরিচয় বহন করে। আর এক উঠতি তরুণ শ্যামসুন্দর ঘোষও দেখিয়েছে সুন্দর শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন। ঠাকুর চাইতেন সবকিছুর মধ্যে ফুটে উঠুক দিব্যতা, সব কিছু হোক সত্য শিব সুন্দরের অভিব্যক্তি। সেদিক থেকে এই শিল্প প্রদর্শনী ঠাকুরের বিশেষ কৃপা পাবেই। অতি সূক্ষ্ম ও উচ্চ মানের শিল্প পরিবেশনের জন্য এই প্রদর্শনী জনগণের বিশেষ প্রসংশা অর্জন করে।

এই দিন রাত্রে সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চনাপুরী রচিত 'এগিয়ে পড়' নাটকটি আশ্রম প্রাঙ্গণে অভিনীত হয়। স্বামী তত্ত্বেশ্বরানন্দের পরিচালনায় বরাহনগর চাঁদনি সংঘ কর্তৃক সুঅভিনীত এই নাটকটী সমবেত বিরাট দর্শক মণ্ডলীকে প্রভূত আনন্দ দান করে।

ছাব্বিশে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যায় নাটমন্দিরে সন্ন্যাসিনী শ্রীঅর্চনা মা রচিত গীতি আলেখ্য "এক মুঠো আকাশ" সাধু ব্রহ্মচারীবৃন্দ কর্তৃক পরিবেশিত হয়। আলেখ্যটি পাঠ করেন সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দ। এই অনুষ্ঠানের পূর্বে ব্রহ্মচারী তারক চৈতন্য শ্রীঠাকুরের জীবনবেদের কয়েকটি বিশেষ দিক নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন।

সাতাশে ফেব্রুয়ারী শ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেবের জন্মতিথি উপলক্ষে শ্রীমন্দিরে পরম পূজনীয়া সন্ন্যাসিনী অর্চনা মা কর্তৃক বিশেষ পূজা, চতুর্থ প্রহর ব্যাপী হোমানুষ্ঠান, চণ্ডী গীতা ভাগবৎ আদি পাঠ, নাম গান পুষ্পাঞ্জলি, এবং প্রসাদ বিতরণ ও বিপুল আকারে ভক্ত ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। পূজার সময় নামগানে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করেন শ্রীপ্রবীর মজুমদার, শ্রীমতী মেনা চ্যাটার্জী ও শ্রীমতী নবনীতা চক্রবর্তী প্রমুখ গীতমুখারসের শিল্পীবৃন্দ। ঐ সময় নাট-

মন্দিরে পাঠচক্র ও নামগানের আয়োজন করেন ব্রহ্মচারী পশুপতি চৈতন্য। পূজা শেষ হবার পরও বেশ কিছুক্ষণ চলে এই অনুষ্ঠানের সূচী।

এই দিন সন্ধ্যায় স্বামী বিমলানন্দের পরিচালনায় সিউড়ী 'সত্যানন্দ গীতিতীর্থ' কর্তৃক সত্যানন্দ গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। এই অনুষ্ঠানের পাঠাংশে ছিলেন স্বামী বিমলানন্দ এবং সংগীতাংশে ছিলেন শ্রীনিবাসী পাল, শ্রীমানবেন্দ্র ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী উমা কর এবং তবলায় ও খোলে সঙ্গত করেন শ্রীঅশোক মৈত্র ও ব্রহ্মচারী গদাধর চৈতন্য। এছাড়া শ্রীচণ্ডীচরণ দাস ও সম্প্রদায় অর্গ্যানে শ্রীঠাকুর ও শ্রীমর্চনা মায়ের গানের সুর বাজিয়ে শোনান।

আটাশে ফেব্রুয়ারী সকালে আশ্রম মাঠমন্দিরে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু সমাবেশে সাধু সম্মেলন ও সাধু সেবার অনুষ্ঠান প্রতিবারের ন্যায় এবারেও আয়োজিত হয়। এতে অংশ গ্রহণকারী প্রায় ষাট সত্তর জন সন্ত মহাত্মাগণ শ্রীঠাকুরের জীবনবেদ এবং বিভিন্ন ধর্মীয় আলোচনার মাধ্যমে শ্রীঠাকুরের চরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। সর্বাগ্রে শ্রীঠাকুরের কণ্ঠস্বরে আশীর্বাণী শোনান হ'ল টেপরেকর্ডে। তারপরই সমাসীন সন্তমণ্ডলীকে বরণ করলেন স্বামী পরমানন্দ ও স্বামী শঙ্কানন্দ। উদ্বোধন সংগীত গাইলেন—স্বামী অক্ষানন্দ ও স্বামী বিমলানন্দ।

এরপর সঙ্ঘপতি স্বামী নির্বেদানন্দজী তাঁর ভাষণের প্রারম্ভে তাঁরই রচিত শ্রীঠাকুরের প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণ করলেন—　　"গিরিগৌরিকমণ্ডিতং জ্যোতির্ময়ং নিত্যানন্দমূর্তিং
করুণাবতারং প্রেমপুলং সত্যানন্দরূপং নিয়তং নমামঃ।

প্রণাম মন্ত্রোচ্চারণের পর স্বামীজী বলতে সুরু করলেন—এই প্রণাম মন্ত্রে শ্রীঠাকুরের সম্বন্ধে দুটি বিশেষণ দেওয়া হয়েছে—করুণাবতার এবং প্রেমপুলং, এ দুটী কথা নিরর্থক নয়, অতিরঞ্জিত নয়। বাস্তবিক পক্ষে ঠাকুর ছিলেন করুণার অবতার প্রেমপুলং। পূর্ণ একটি প্রেম সত্তা। তাঁর এই করুণা শুধু মানুষের ওপর ছিল না, মনুষ্যেতর জীবাদির ওপরও ছিল, বৃক্ষলতা গুল্মাদির ওপরও ছিল, তাছাড়া আরও ছিল পরলোকগত আত্মাদের প্রতি। পরলোকগত আত্মার প্রতিও তিনি অশেষ কৃপা বিতরিয়েছেন এবং ক্রমমুক্তির পথে তাদের এগিয়ে দিয়েছেন। সহস্র সমাধিধারী এই পুলং পথের মাঝে একটা কুকুরকে দেখলেন, তখনই কলকাতার জনাকীর্ণ পথে লোকের কৌতূহল তুচ্ছ করে তার কাছে গিয়ে বসলেন এবং জল, খাবার ও শুশ্রূষা দিয়ে সুস্থ করার চেষ্টা করতে লাগলেন। তাঁর হাতের খাবার, জল, সেবাটুকু পেয়ে সে সুস্থ হয়ে উঠলো। আশ্রম প্রাঙ্গণে একটি বেড়াল তাড়া খেয়ে নিখোঁজ হল। সে কথা ঠাকুরের কানে যেতেই অন্নজল ত্যাগ করলেন। বললেন, যতক্ষণ না তাকে খুঁজে এনে দেবে ততক্ষণ কিছুই গ্রহণ করবেন না। ছুটোছুটি পড়ে গেল। যে ভাবেই হোক তাকে যখন খুঁজে এনে খাওয়াদি দিয়ে সুস্থ করা হ'ল, তখন ঠাকুর আহার গ্রহণ করলেন।

অবগুণ্ঠনবতী কোনও গৃহস্থ বধূ হাত পেতে দাঁড়াল ঠাকুরের সামনে। হাতে যা ছিল উজাড় করে দিয়ে দিলেন এবং আবার আসতে বললেন তাকে। তার আর্থিক প্রয়োজনটুকু যথাসম্ভব মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করলেন। এভাবে সংকটের সময় ঠাকুরের সহায়তা ও আশীর্বাদ পেয়ে অনটন ক্লিষ্ট ঐ সংসারে ধীরে ধীরে স্বচ্ছলতা ফিরে এল।

আমাদের মত কত শত অধমকে তাঁর কৃপার ছত্রছায়ায় এনে তাদের পরলোকের গতি ঊর্ধ্বগতির ব্যবস্থা করে দিলেন। মানুষ মনুষ্যেতর জীবই শুধু নয়, বৃক্ষলতার ক্ষেত্রেও দেখি ঠাকুরের সমান করুণা। আশ্রমে একটি প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছ হঠাৎ শুকিয়ে যেতে শুরু করলো। বিশেষজ্ঞরা দেখে বললেন, এ বৃক্ষ বাঁচবে না। ঠাকুর খুব দুঃখিত হলেন। ঐ কৃষ্ণচূড়ার ছায়ায় বসে কত কত হোম হয়েছে, নাম কীর্তন হয়েছে সে আমাদের চোখের সামনে এমনি করে শুকিয়ে যাবে। তৎক্ষণাৎ গোপালের চরণামৃত দিলেন, ইনজেকশান দিলেন, যারা যা বললো সব ব্যবস্থা করলেন। তারপর একসময় বললেন—'খুব পা আসা করছে, একটু ঘুইরে দিবি তোরা।' উঠে কৃষ্ণচূড়ার নীচে দাঁড়ালেন ঠাকুর। রৌপ্য পাত্রে জল এনে সিঞ্চন করে দেওয়া হ'ল পদযুগল। সে চরণামৃত কৃষ্ণচূড়ার মূলে প্রবেশ করলো। আশ্চর্য্য এই যে,

যে বৃক্ষ শুকিয়ে গিয়েছিল মুকুরিত হবার কোন আশাই ছিল না, সেই বৃক্ষ পনের কুড়ি দিনের মধ্যেই পত্রে পুষ্পে কচি পল্লবে সজ্জিত হয়ে উঠলো। তাঁর আশ্রমের কুলবধূরা ওই কৃপাটুকুর অপেক্ষাই যেন করছিল। আজও সে বেঁচে আছে এসব কথার সাক্ষী বহন করে।

রাসবনের দুটি নদীর চরের মাঝে ঘন বনের মধ্যে বসে হোম করলেন ঠাকুর আমাদের সকলকে নিয়ে। তারপর নিকটস্থ একটি বটবৃক্ষের নীচে দাঁড়িয়ে হঠাৎ ঠাকুর বললেন—আন্‌তো রে কিছু দুধ আর খাবার। সেগুলি আনা হ'লে বললেন—ঐ গাছের কোটরটিতে ওগুলো রেখে দে। রাখা হ'ল। কিছুক্ষণ পর দেখা গেল দুধ আর খাবার যা রাখা হয়েছিল সে সবই উবে গেছে নিঃশেষে। জানিনা বৃক্ষদেবতা সেটী গ্রহণ করলেন কিনা! আজো জলজল করছে সে কথা। শ্রীঠাকুরের শয়ন মন্দিরের কাছে একটি যুঁইলতা ছিল। জানলা গলিয়ে সে ঘরে আসার চেষ্টা করতো হয়তো ঠাকুরের একটু আদর পাবার জন্য। কিন্তু সেবক সেবিকাদের মধ্যে কেউ একজন ভাবলো—লতা বেয়ে যদি কোনও সরীসৃপ ঘরে এসে ঢুকে ঠাকুরকে দংশন করে—তৎক্ষণাৎ যুঁই লতাকে অপসারণ করার ব্যবস্থা করলো সে। ঠাকুরকে না জানিয়ে চুপিচুপি লতাটিকে উপড়ে অন্য জায়গায় পুঁতে দিল। ঠাকুর ধ্যানে বসেছেন। হঠাৎ রাশি রাশি যুঁই ফুলের গন্ধে ঘর ভ'রে গেল। কোথা থেকে এল এই রাশিরাশি যুঁই এর গন্ধ? ঠাকুর জানলেন, জানালার পাশের যুঁই লতাটি অপসৃত হয়েছে। সে যাবার সময় তার প্রভুকে দিয়ে গেল সুরভির উপঢৌকন। এ অতিরঞ্জন নয়। অতিবাস্তব সে সব ঘটনা।

গভীর রাত্রে ঠাকুর হয়ত ধ্যান করছেন। সে সময় উপস্থিত কোনও আত্মা। ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করলো সে—ইচ্ছা ছিল জীবৎকালে আপনার কাছে সন্ন্যাস গ্রহণ করবার কিন্তু সে আশা পূরণ হয়নি। সন্ন্যাস আমাকে দিতেই হবে ঠাকুর। ঠাকুর বলেন—সে কি গো! প্রেতাত্মার আবার সন্ন্যাস? সে বলে—তা জানিনা ঠাকুর, সন্ন্যাস দিতেই হবে। ঠাকুর করুণাময়, কৃপাময়। সেই প্রেতাত্মাকে উনি করলেন সন্ন্যাস দানে। ইতিহাসের পাতায় আজও এমন ঘটনা লিপিবদ্ধ হয়নি। এ সব বিনিময় আমরা ঠাকুরের কাছে হ'তে দেখেছি। একটি প্রেত গভীর দুঃখ নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে সাহায্য প্রার্থনা করে। ঠাকুরের কাছে দীক্ষা চাইছে। ঠাকুর তাকে জীবদ্দশায় বলেছিলেন দীক্ষা দেব। কিন্তু প্রাণ থাকতে তা হ'ল না। সে পীড়াপীড়ি করতে লাগলো দীক্ষা দিতেই হবে। করুণাবতার ঠাকুর আমার, দীক্ষা দিলেন, তার আত্মার কল্যাণ ও মুক্তির ব্যবস্থা করে দিলেন। শুধু দীক্ষা সন্ন্যাস নয়, কত কত আত্মা প্রসাদের জন্য আসতো। সে রকম কোনও প্রেতাত্মা এলে ঠাকুর নিজ হাতে তৎক্ষণাৎ প্রসাদ তুলে তার হাতে দিয়েছেন। কত যে ঘটনা মনে আঁকা আছে, কত বলব। সে করুণার কথা কৃপার কথা দুটি একটি কথা নয় ঘটনা নয়, ঘটতে দেখেছি দিনের পর দিন, বছরের পর বছর—প্রায় ত্রিশ বছর তাঁর পদছায়ায় থেকে। আজও সূক্ষ্মে তিনি যে কাজ করে চলেছেন সে কাজের সীমা নেই। তিনি অতন্দ্র প্রহরী হয়ে কাজ করছেন ভক্তদের সর্বরকম সুবিধা স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য, তাদের রক্ষা করার জন্য। কোথায় হাসপাতালে কাতর রোগিণী কাতর প্রার্থনা জানিয়েছে—ঠাকুর ছুটেছেন সেখানেও। রোগিণী দেখলেন—ঠাকুর তার শয্যার ওপর উঠলেন বড়র পায়ে। সে আনন্দে চীৎকার করে তাঁর পায়ে পড়লো। নন্‌কাল মুভমেণ্ট যখন পুরোদমে চলছে তখনকার কথা। বাগবাজারে একটি বালিকা বিদ্যালয়ের ছুটি হয়েছে। দলে দলে সব মায়েরা বাড়ী ফিরছে। দুটি বালিকা এবং হেডমিষ্ট্রেস গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন গাড়ী পেয়োবার অপেক্ষায়। হঠাৎ চার পাঁচটি ছেলে ছোরা হাতে এসে দাঁড়ালো তাদের সামনে আর বললো—চলো আমাদের সঙ্গে। মেয়ে দুটির বাবা শ্রীঠাকুরের দীক্ষিত সন্তান। তারা কখনও আশ্রমে আসেনি কিন্তু বাড়ীতে ঠাকুরের মূর্ত্তিতে পূজো করে আর ঠাকুরের নাম করে। বিপদ বুঝে চীৎকার করে ঠাকুরকে ডেকেছে—'সচ্চিদানন্দ রক্ষ মাম্ সচ্চিদানন্দ পাহি মাম্' ব'লে। একথা তারা তাদের বাপের কাছেই শিখেছে। এক মিনিটও হয়নি, অতর্কিতে তারা দেখে এক দিব্যকান্তি সৈরিক মণ্ডিত সন্ন্যাসী এসে উপস্থিত। তাঁর মুখে একমুখ দাড়ি আর হাতে ত্রিশূল, দুষ্টকে দমনের জন্য উদ্যত হস্তে দণ্ডায়মান ছেলেগুলো কি যে দেখলো জানিনা, এক নিমেষে যে

সেদিকে পাগল পাগল। বালিকা দুটি তাঁকে দেখেই চিনলো, কারণ বাড়ীতে তাঁর পটমূর্তি তারা দেখেছে এবং পিতার কাছে শুনেছে। হেডমিষ্ট্রেসও দেখলেন। রাস্তা পার হ'য়ে মেয়ে দুটিকে জিজ্ঞাসা করেন, কে ওই দিগম্বর সন্ন্যাসী? মেয়েরা পরিচয় দেয়, তিনি তাদের পিতার গুরুদেব। শুনে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কোথায় থাকেন উনি? এতক্ষণে মেয়ে দুটি বুঝি সম্বিৎ ফিরে পেল। আরে। উনি যে কিছুদিন আগে দেহ রেখেছেন। উনি তো আর নেই। তবে একি দেখলাম আমরা। সবাই স্তব্ধ। মেয়েরা বাড়ী গিয়ে পিতাকে সব জানালো এবং বললো হেডমিষ্ট্রেস তাঁর সাক্ষাৎ-প্রার্থী। পিতা ভুলে গেলেন। হেডমিষ্ট্রেস সীট ছেড়ে ত্রস্তে উঠে এসে তাঁর পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন—বাধা দেওয়ায় বললেন—আপনি আমাদের প্রণম্য—এমন শক্তিশালী মহাপুরুষের আশ্রয় আপনি পেয়েছেন, আপনি বড় ভাগ্যবান ধন্য আপনি। আপনার গুরুদেবের কৃপায় আমাদের জীবন এবং ধর্ম রক্ষা হল।

এরকম কত কত ঘটনা যে ঘটেছে তার ইয়ত্তা নাই। মহান আচার্যের পদতলে তিরিশ বছর বসে থেকে সে সব দেখেছি শুনেছি আর আজও দেখছি শুনছি। দেহ-রক্ষা-কালে ঠাকুর বাণী দিয়ে গেলেন—তোমরা শান্তিতে কুশলে থাক, সকলের কল্যাণ হোক্, মঙ্গল হোক্, শান্তি হোক্। আজ এই অশান্ত জগতের বুকে হে ঠাকুর তুমি আবার বল—আবার বল—শান্তি হোক্ কুশল হোক্ মঙ্গল হোক্।

দরদী ঠাকুর প্রেমের ঠাকুর আমাদের প্রাণের ঠাকুর শ্রীসত্যানন্দের মধুলীলা মধুর চেয়েও মধু। আজ তাঁর আদরের 'মাণিকপীর'র দরদী কণ্ঠের হৃদয়স্পর্শী আবেগ সকলের বুকে জাগায় একটি মৃদু আলোড়ন। সমবেত সাধু মণ্ডলী ভক্তমণ্ডলী সবাই মুগ্ধ শ্রবণে শুনলেন আর অশ্রুসিক্ত নয়নে ডুবে গেলেন শ্রীঠাকুরের ধ্যানে।

একটু পরে **নিগমানন্দ সারস্বত আশ্রমের ব্রহ্মচারী বিকাশ চৈতন্যজী** আমাদের ঠাকুর সম্বন্ধে বললেন—"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর"—সেই অসীম শক্তিধর মহাপুরুষ,—মহাপুরুষ বললে ছোটই বলা হয়—কৃষ্ণ ভগবান স্বয়ং—সাক্ষাৎ ভগবান ধরায় এসে লীলা করে গেলেন ঠাকুর সত্যানন্দের রূপে। তাঁর সম্বন্ধে শাস্ত্রকারেরা বললেন— বিপ্রা বহুধা বদন্তি—তবু বলা অসম্পূর্ণই থেকে যায়। পরম শ্রদ্ধেয় ঠাকুর সত্যানন্দ মহারাজ ছিলেন জন্ম মৃত্যুর জ্ঞাতা। তিনি ছিলেন আনন্দস্বরূপ, তাই বসিয়ে গেলেন এই আনন্দমেলা। আমরা একটা বিরাট আনন্দের ঢেউয়ের আকর্ষণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড খণ্ড আনন্দ তাঁর চরণে এসে মিলিত হয়েছি, ঠিক যেমন নদী সকল সাগরে মিলিত হয়। আমি তাঁকে সাক্ষাৎ গোপাল ভাবে দেখি। আর আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, দক্ষিণেশ্বরের রামকৃষ্ণই আবার গোপাল-রূপে অবতীর্ণ হয়েছিলেন ঠাকুর সত্যানন্দের মাঝে। যাঁরা ভাব নিয়ে আছেন তাঁরা একথা নিশ্চই অকুণ্ঠে স্বীকার করে নেবেন। শ্রীঠাকুর ছিলেন করুণাঘন প্রেম অবতার। আমরা ভাগ্যবান। তাঁর সাথে যোগ আছে তাই আমরা নিশ্চিন্ত।

ঋষিকেশের ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী মহারাজ বলেন—ঠাকুর সত্যানন্দ শুধু সত্য আর আনন্দের রূপ নন তিনি সাক্ষাৎ সৎ-চিৎ-আনন্দ। আদি এবং অন্ত যার আছে তার মধ্যও আছে। কিন্তু সেই ঠাকুরকে আমরা ঠিক ঠিক জানতে পেরেছি কি? ঠিক ঠিক না জানলে তাঁর পূজাও ঠিক ঠিক করতে পারিনি। যেদিন তাঁকে ঠিক ঠিক জানবো—সেদিন 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি' অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপই হয়ে যাব। কিন্তু সেটা হয় না, যতদিন না চিত্তের মলিনতা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয়। যদি আমরা কামনা বাসনা ত্যাগের দ্বারা, নিষ্কাম কর্মের দ্বারা, রাগ দ্বেষ বিমুক্ত, শুদ্ধ অন্তঃকরণযুক্ত হই তবেই তাঁকে উপলব্ধি করতে পারবো। আমাদের চিত্তের চঞ্চলতা ত্রুটি এবং সংশয় বুদ্ধিকে ত্যাগ করে এগিয়ে যেতে হবে। ঠাকুরকে উপলব্ধি করতে গেলে ঠাকুরই হয়ে যেতে হবে। তাই বিশ্বাস সহায়ে এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের কাজ ধীর স্থির বিশ্বাস নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। তিনি কৃপা করে নিশ্চই নিয়ে যাবেন।

পাঠবাড়ীর বাবাজী মহারাজ বৈষ্ণবোচিত দীনতা সহকারে বলেন—মহৎ না হলে মহৎকে জানা যায় না,

মতের কথাও বলা যায় না। আমি এখানে সাধু সঙ্গের লোভে হরিকথা শ্রবণের লোভে আসি, শ্রীঠাকুরের কৃপা পাওয়ার লোভে আসি। এই বলে উনি একটি কবিতা আবৃত্তি করে শোনালেন—

"মন শোন্ শোন্ তুই অতি বর্ব্বর
শত সন্ধি জর্জ্জর, পেয়ে এই কলেবর
কিবা গর্ব্ব করিছ অন্তর "……

শ্রীদেবদাস ব্রহ্মচারীজী বলেন—ঠাকুর সত্যানন্দদেব একটা অলৌকিক ভাব এবং প্রভাব নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সেই অমল কমল নিবাসী নটবরকে কেমন করে দেখব। তার জন্য চিত্তকে বিমল করে তুলতে হবে। তার জন্য ভগবান বললেন—'তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন'। কিন্তু কি ক'রে সব সময় তাঁর সঙ্গে যোগযুক্ত থাকা যায়? তার একমাত্র উপায় তাঁর চরণ শরণ করা। কৃতনিশ্চয় হতে হবে অর্থাৎ 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন'। বুদ্ধদেব হতে সত্যানন্দদেব পর্য্যন্ত যাঁরাই সেই পরম আনন্দ লাভ করেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে এই একই মন্ত্র, কৃত-নিশ্চয়তার মন্ত্রই মূর্ত্ত হয়েছে। 'ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি'র প্রত্যক্ষ রূপ ছিলেন স্বামী সত্যানন্দদেব ধন্য তাঁরা যাঁরা তাঁর দিবা সঙ্গ করেছেন।

ভারত সেবাশ্রমের স্বামী প্রেমানন্দজী বলেন—স্বামী সত্যানন্দদেব প্রবর্তিত এই পুণ্য মিলন বাসরে বিভিন্ন আশ্রমের সাধুদের যে মিলন ব্যবস্থা এটা খুবই আনন্দের কথা। আজ দেশের পক্ষে এই ধরণের সম্মেলনের মাধ্যমে সত্যানন্দদেব প্রমুখ মহান্ পুরুষদের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন সত্যিই প্রয়োজন। দেশের জন্য কিছু নিঃস্বার্থ সেবা আমাদের করতেই হবে। এই দুর্দ্দিনে অশান্তির দিনে দেশের জন্য জাতির জন্য অনেক কিছুই করণীয় আছে। এই আশ্রমের সিউড়ী দুবরাজপুর প্রভৃতি শাখায় ঘুরে আমি দেখে এসেছি, সুন্দরভাবে স্কুল কলেজ হাসপাতাল ইত্যাদি এবং বিভিন্ন জনহিতকর কাজ চলছে। এই সব স্কুল কলেজ থেকে আশা করি সত্যিকার ভাল ছেলে বেরিয়ে আসবেই যারা জাতিকে এই দুর্দিনের হাত থেকে মুক্তি দেবে। আজ মানুষ আধ্যাত্মিকতা চায়। যদিও আজ রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের রক্তে মানুষ লাল হয়ে উঠেছে, তবু সে চায় একটু শান্তি এবং সেইজন্যই সে চায় আধ্যাত্মিকতা। এই সব মহাপুরুষেরা শান্তির বৃক্ষ আধ্যাত্মিকতার বৃক্ষ রোপণ করে গিয়েছেন এবং আমরা তার ফল ভক্ষণ করছি। কিন্তু শুধু নিজেরা খেলে হবে না জগতের বুকে ছড়িয়েও দিতে হবে।

সব শেষে আমাদের পূজনীয় **প্রভাকর মহারাজ** (স্বামী বিবিদিষানন্দজী) সমবেত সন্ত মণ্ডলীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। এই দিন সন্ধ্যায় বীরভূমের বটের বাউল সম্প্রদায় বাউল সংগীত পরিবেশন করেন। অতঃপর রাত্রে ভারত সরকারের Field Publicity Department এর সৌজন্যে আশ্রম নাটমন্দিরে মনোমুগ্ধকর 'মৌকাবিলাস' কীর্ত্তন পরিবেশন করেন শ্রীকানাইলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহশিল্পীবৃন্দ।এরই সঙ্গে সমাপ্ত হ'ল মহোৎসবের দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান।

★

"ধর্ম্মরাজ্যে যারা পথিকৃৎ, পথচারী, তাদের সকলেরই 'আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায়, জীবন যাপন করা উচিত। ধর্ম্মরাজ্যে সেইজন্য আমাদের যা খুশি ধর্ম্মাচরণ করা চলবে না। সমষ্টির কল্যাণ দৃষ্টিও প্রয়োজন। সাধুগৃহী প্রত্যেককেই মনে রাখতে হবে, সংঘই শক্তি। কাজেই এই সংঘশক্তি বৃদ্ধি করা সব ধর্ম্মপথের পথিকদের কর্ত্তব্য।"

—শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দদেব

একটি জীবন একটি সমাধি

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত

ভ্রমালো বালক এক, চিন্তাশীল উজ্জ্বল বয়ান
"কেন আমি স্বাচ্ছন্দ্যে লালিত
অন্য শতজন কেন ফিরিতেছে দুঃখে ম্রিয়মাণ
অভাবে ক্ষুধায় জর্জরিত ?"

গ্রামখানি ছায়াবীথি আতপত্রে হরিৎপত্রের,
এক পার্শ্বে রজতের ধারা
অন্য পার্শ্বে সুবিস্তীর্ণ হিরণ্য অঞ্চল ক্ষেত্রের
দুলিয়া দুলিয়া হয় সারা।

গৃহেতে জননী তার ছোট জমিদারের ঘরণী—
তীক্ষ্ণদৃষ্টি পুত্রের শিক্ষায়
দিব গড়িবার মত গড়ি তোলে আনন্দ নিঝুনি
পুত্র চিত্ত মন্থন আভায়।

প্রকৃতির আবেদন, জননীর স্নেহ আবেষ্টন
বালকের পথের সম্বল
রবীন্দ্রনাথের কাব্য জননীর আদরের ধন,
পুত্রের হৃদয়ে দিল বল।

শিবের নামেতে নাম শিবসম তোগে উদাসীন
শম্ভুনাথ মনে মনে কহে
মানুষের সুখ দুঃখে এ বৈষম্য নিতান্ত কৃত্রিম
বিধাতার সৃষ্ট কভু নহে।

নিশ্চয় মানব লাগি ধাতাসৃষ্ট অন্য কোন ধন,
রহিয়াছে আবৃত তিমিরে
যে ধন সন্ধানে আসি একদিন দরিদ্র ব্রাহ্মণ
স্পর্শমণি ফেলে নদীনীরে।

সেই ধন আহরণ কোন পথে করিবারে পাই
প্রয়োজন তাই শুধু জানা
তিমির করিয়া ভেদ কোনরূপে দেখা দেলে ঠাঁই
বিদ্বেষের রবে না ঠিকানা।

সে ধনে যাহারা ধনী দরিদ্র বঞ্চিত জনপ্রতি
নাহি করে নাসিকাকুঞ্চন
শিক্ষা দেয় দীক্ষা দেয় বিনা ব্যয়ে যত্ন করে অতি
চিনাইতে সে অব্যয় ধন।

একথা বালকচিত্তে অহরহ রহে জাগরূক
কর্ম্মে তবু নাহি অবহেলা।
বালক যুবক হ'ল কর্মযোগী অথচ তাবুক
ভাবে কবে পাবে সেই বেলা

সংসারের কর্ম্মে তার অন্ধ্বেষণের মতই সন্ধান
মানসে প্রতীক্ষা অজানার
চীনাংশুর শূককীট মহাপরিবর্তনের ধ্যান
করে যথা চিত্তে আপনার।

সে সময়ে মুখে তার যে দেখিত চেয়ে, দেখিত সে
দূরাগত সুখের যন্ত্রণা,
যার তরে শূককীট আপনাকে ঘিরে প্রীতিরসে
গড়ি তোলে জালের রচনা।

কর্ম্মঠ যুবক সেই অকিঞ্চিতকর কর্ম্মরাজি
একদিন কাটি বাহিরিবে
আপন স্বরূপে তার তপস্যার বর্ণালীতে সাজি
ভাস্বর উদয়ে দেখা দিবে।

তারপরে একদিন এল এক মুহূর্ত পরম,
প্রকৃতির ছায়াবীথি তলে
লভিল আকাশপথে দৈববাণী নহে, অনুপম
দৈবলিপি গাঢ় পত্রদলে।

সে দৃষ্টিতে কি যে ছিল ভাবিতে ভাবিতে কাটে কাল
মুগ্ধ হয়ে রহিল অন্তর
ব্যাধের বাঁশরী যেন বিছাইয়া মায়াময় জাল
ঘুরঙ্গে ভাসিল নিরন্তর।

নশ্বর সংসার কর্মে কাটে আরো বর্ষ কতিপয়
পরীক্ষায়, সংশয়ে সঙ্কটে
একদা কহেন গুরু সম্বোধি নিজেকে "আর নয়
এইবার টানিব নিকটে।"

হরিদ্বারে ব্রহ্মকুণ্ডে একদিন নিশীথ সময়ে
ছিল যুবা ভারাক্রান্ত মনে
"জপধ্যান প্রার্থনায় রত থাকো অনলস হয়ে"
কে কহিল তাহার শ্রবণে।

চমকি চাহিয়া দেখে চারিধারে কেহইতো নাই
আতঙ্কেতে কাঁটা দিল গায়ে
আতঙ্ক আনন্দ হ'ল বুঝিল সে পাবে তবে ঠাঁই
এতদিনে গুরুপদছায়ে।

গুরুর মানস মূর্তি একলব্য সম চিরদিন
ছিল তার মহাযোগী মনে
অদৃষ্ট গুরুর পদে হয়েছিল একান্তে বিলীন
জ্ঞান কর্ম ভক্তির সাধনে।

"তবু তো সে মহাধন লভ্য নহে গুরুর বিহনে,
ভাবিল যুবক রাত্রি দিবা।
"কোথা আছে সেই গুরু আমার মানস মূর্তিসনে
মিলে আছে যাহার প্রতিভা?"

দিগন্তে অস্ফুটে যবে রক্তিম আলোক ওঠে জাগি
আনে বার্তা সহস্র রশ্মির,
তেমনি এ দৈববাণী 'জপধ্যান প্রার্থনার লাগি'
প্রতিজ্ঞা রহিল সুগভীর।

পরে একদিন যবে কোন এক পবিত্র আশ্রমে
বসেছিল সাধুসঙ্গ লোভী
"জপধ্যান প্রার্থনায় রত থাকো অনলস হয়ে"
কে কহিল ভাবময় ছবি।

"এই তো আমার সেই পত্রপত্র নেত্রসমন্বিত
মানসের গুরুমূর্তিখানি?"
কহিল সে রোমাঞ্চিত, "এই তো সে পুনঃ উচ্চারিত
জপধ্যান প্রার্থনার বাণী।"

তখন চিনিল যুবা সম্মুখে তাহার ইষ্টগুরু
উঠি গিয়া পড়িল চরণে
নূতন অধ্যায়ে দেখি গুরুশিষ্যে যাত্রা হ'ল শুরু
তপস্যার বন্ধুর শরণে।

স্বামী শিবানন্দ নামে পরিচয় লভিল জগতে
জয়াঙ্কিত ছিল সেই নাম,
সে শিব সন্নিধি আসি জুড়াইয়ে দুঃখের ক্ষতে
বহুলোক লভিল আরাম।

স্বামী সত্যানন্দ পদে স্বামী শিবানন্দ বিরাজিল
পারিজাত পুষ্পের মতন,
প্রণয় সৌরভ তার ব্যাপ্ত হ'য়ে ভরিল নিখিল,
উগ্রযোগ রহে সঙ্গোপনে।

কণ্টক বিক্ষত পদে দেহবোধ করিয়া বিলয়
উত্তরিল সে ধনের দেশে,
তপঃক্লান্ত স্বচ্ছধামে, প্রাণ বেথা শান্ত দীপ্তিময়
মণিদীপ হয় অবশেষে।

"হে দেবতা, হে মহেশ, পরমাত্মা তুমি জগতের"
শিবানন্দ করিল প্রার্থনা
"আমার এ ক্ষুদ্রব্রতে নীলকণ্ঠ। তব ঐশ্বর্য্যের
এক বিন্দু আমার কামনা।

যে অক্ষয় মহাধন, বিতরিলে যত নাহি হয়
দাও মোরে সেই ধন তব,
তার জ্বালা বক্ষে ধরি পরিপূর্ণ করিব হৃদয়,
প্রদীপ-জ্বালিব নব নব।"

অন্তরের চিরযোগী আজন্মের সে অধ্যাত্মমুখী
ইষ্টদেবে মিলাল সম্বিৎ,
যজ্ঞফল মহাধন জনে জনে বিতরণে সুখী
জীবনেরে করিল সমিধ।*

* শিবানন্দজীর স্মৃতিসভায় সভাপতি স্বামী নির্বেদানন্দজী কর্তৃক পঠিত।

প্রণাম তাঁহার পদ্মপদে

[শ্রীজ্যোৎস্না নাথ মল্লিক কর্তৃক ধ্রুবরাজপুর আশ্রমের
সেবাব্রতী স্বামী কৃপানন্দ মহারাজকে লিখিত পত্র]

ভাই কৃপানন্দ,

তোর মারফৎ ঠাকুরকে প্রণাম জানাই।

ইন্দ্রত্ব ত্যাজিয়া যাঁর ঘরে
বন্ধু মোর হলে সিদ্ধকাম,
সারাদিন কর্ম্মারতি চলে
সর্ব্বক্ষণ জপ যাঁর নাম।
কি আনন্দরাজা পেলো মন,
কি সাহস শক্তি সদা বুকে,
কি আশ্বাস প্রতিটি নিশ্বাসে,
কি সহজ হাসি সদা মুখে।
যাঁর স্পর্শে ব্রেজারের কোট
খসে যায় রেশমী গলাব্রাণ,
শোভে অঙ্গ গৈরিক বাসে,
গৈরিক বর্ম্ম শিরস্ত্রাণ।
লাগে না লাগে না খর-তাপ
রৌদ্রদগ্ধ পিচগলা পথ
যাঁর ক্রোড়ে নির্ভয়ে বেড়াও
সদা চড়ি' দিব্য মনোরথ।

যাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করি চলো
সর্ব্ব সম্ভব যাঁর চাওয়া
নাই ধরা সরে যায় বাধা।
ধীরে ধীরে ভাসে রূপ দেওয়া
যাঁর কৃপা নবদৃষ্টি দানে,
ভাবরূপ নেত্রে অবিরাম
অন্তরেতে যাঁর কথামৃতে
গম্ভীরা রচিলে অভিরাম।
আশ্রমে লভিয়া আশ্রয়,
'রক্ষ মাম্ পাহি মাম্' নাম,
সংসার সরায়ে নিত্য লভ
সংসার সত্যানন্দ-ধাম
হেরিতে এ বেঁচে থাকা সুখ,
কল্যাণ হোম শান্তি হৃদে,
হে বন্ধু তোমারে প্রণাম
প্রণাম তাঁহার পদ্মপদে।

প্রীতিবদ্ধ
জ্যোৎস্না

World Psychology

Sreemat Swami Satyananda Deva

Contd. from "The Western Psychology")

[In the previous issue, the author discussed gestalt psychology as given by Thoulass and S S. Sargent.

In Thoulass, Wertheimer's experiment on movement of perception, sensation and perception according to Gestalt psychology, meaning of the term Gestalt, special use of this term and its better description, which, for Kobler, is the field theory of psychology, properties of the field theory, Theory of Isomorphism or the theory of physiological concomitants, illustration of the theory, Kohler's suggestion and Wertheimer's postulation about the theory. Kobler's acceptance of the field theory in both physical and psychological phenomena, Gestalt's application in other fields, were discussed.

In the synopsis of the Gestalt theory, as done by S. S. Sargent, experience according to gestalt psychologists, relationsoip between the individuals to form a whole. Kobler's experiment on the importance of relationship in the whole, Kohler-Koffka's findings about the relationship between the figure and the background, term 'closure' for Gestalts, explanation of illusions by the 19th century psychologists, Woodworth's six rules about gestalt, were dealt with.]

Kurt Lewin

Lewin may be recognised as a Gestalt psychologist or the founder of Field Theory. He was a pioneer in applying the Gestalt theory to motivation. Mind is a dynamic tension-system and behaviour relieves the tension to reestablish the balance. The wider field of which we are members, is the physical and social environment and is called the life-span. The objects in the span has negative or positive valence, i. e, has attractions and detractions. The vector, according to him, gives a locomotion. This locomotion may be physical or social. This locomotion may be barred by barriers. It is a 'constraint' that is static but offers some resistance when force is applied to it. A box may bar our way but so long it is not pulled aside, it is not known how heavy it is.

Lewin gives some methodological discussions. He gives in his 'principles of topological psychology' adequate system of mathematical concepts. He emphasises the environmental conditions and momentary conditions of the drive.

He also studied dynamics of memory. He showed, there is no linking of ideas by association. Successive presentation of stimuli has nothing to do with their functional connections. Each word or nonsense syllable is linked by the way in which they are in the field organisation as a whole.

He represented graphically the nature of psychological impulsions, the resistance to such impulsions and the transformations in movements towards the goal. That is the result. He gives two figures depicting a child's mental condition when barred from a desired attitude. A child wants to go to a party but is barred by the perents. He goes 'out of the field', withdrawing himself in a day dream, substitutes a field of another level where the barrier is porous to enable him to imagine ways of avoiding his parents.

He followed Zeigarnik in his study of tension. Zeigarnik gave some tasks to

subjects and interrupted some to finish them. The subjects that were interrupted were able to recall the task more than those who were not.

He gives a topological term for freudian regression. It is differentiation.

A new-born child has a mind which is an undifferentiated whole. Gradually as the child becomes aged the mind becomes differentiated at its periphery into sensory regions and motor regions. Later inner world of memories, images, values and purposes make the child more specific. Intense frustration makes differentiation. Thus when a child carrying on a conversation with a toy telephone when frustrated loses the 'mature behaviour' and fails to use it as a rattle.

He made huge investigations on leadership which was divided into authoritarian-laissez faire or democratic pattern. The effectiveness of the individual under these leaders was studied by him. He was invited to set up the research centre in group dynamics in Massachussets Institute of Technology.

Though there are several objections levelled against his theories, his contributions to child psychology, to social psychology and to general psychology are very great.

Behaviour, according to him, depends on the total co-existing facts, and the co-existing things are dynamic in nature for in this any part depends on every other part of the field. Behaviour of a man depends not on his past nor on his future but on his present field.

His two main books are "A dynamic theory of personality" and "Principle of Topological Psychology".

A. F. Shand.

Shand's special merit lies in his analysis of character. He gives the constituent factors of character, their relations between themselves and between the whole and the parts. There are three components which are instincts in the animal level of mental development, emotions in the child level of mental development and a sentiment in the human adult level of existence.

The first is the most perfect and most fixed having no influence of intelligence. It is like habit and is orderly in chracter.

The second is unstable, disorderly and sudden in nature and is a step to the higher level ; the third level is the reflective stage of reason and self-control Instinct gives a moderation and stableness of character to emotions. Emotion, on the other hand, brings resources to master a situation and it is more complex and adaptive in character. Sentiments are the real controlling and authoritativ components of character, love and hate of which are the most important and basic expressions. They control the emotions by strengthening those that are weak, weakening those that are strong or suppressing the harmful ones. Consciousness is a unique sentiment that is the result of the moral views of the community in which a man is born and which he takes upon himself as unquestionable. Instincts, habits, impulses, appetites, emotions and sentiments are the manifest components of character but the potential factor of character, its background and underlying foundations are stretched beyond our investigation and is the limiting border of our knowledge.

Spiritual Talks

(From R. L. Goel's Diary)

ABHEDANANDA MELA AND KATYANI PUJA AT DUBRAJPUR (29 11. 65 To 3. 12. 65)—contd.

1. 12. 65.

Ashtami Puja.

It was 7 A.M. Several devotees from Calcutta, some local devotees and Sadhus were sitting in the Verandah The Temple was just opened. All the devotees prostrated before the Lord.

Lord chanted the sacred hymn followed by the devotees and then rested on foot with His hands raised, which only few could copy while others merely raised their hands and silently uttered some *mantras*. Kathamrita was then read by Swamiji. Just then Aarati commenced and continued upto 8 A.M.

Mandir was now arranged for Ashtami Puja. Kaka (Thakur's uncle) had already arrived. He entered the Mandir with Gourishankar Kavirajji. Lord touched the feet of Kaka and then Kaka occupied His Asan before the Divine Mother. Kavirajji who had to conduct the Puja, first offered flowers at the Lotus feet of the Lord and then puja started. Puja continued upto about 11 A.M.

After the puja all the devotees offered flowers at the lotus feet of the Divine Mother. The devotees then had prasad.

After a few minutes Lord also came out in the open and He decided to play Badminton. It was a bright sunny noon. The court was marked with lime. Net was arranged. Four Rackets and a shuttle cork were brought and the Badminton play started with two players on either side. In a few minutes the game was over and Lord had won. Now Lord retired and only watched others playing it and many times clapped on good shots. Lord now retired to the inner chamber.

At about 1-30 P.M Lord again came to the Temple with the Sanyasin Mothers and Chandi was recited by them (a part of it) within the doors closed. After Chandi Temple doors were opened and Lord was seen sitting on His Asan. Lord had some talks with the devotees and again retired at about 2-30 P.M.

In the evening there was the programme of Sishu Sammelan (children's gathering) which started at 4 P. M. and continued upto 7 P. M.

Evening with Lord :

It was 9 P.M. Several devotees were sitting in the Verandah. Temple was now opened . All the devotees prostrated before the Lord and He blessed them all.

Aarati had already commenced and continued upto 9-30 P.M. when the Temple front doors were closed.

After Aarati Temple doors were again opened at about 10 P.M. Swami Nachiketasananda (who had come from Calcutta with his Gopalji) and all other devotees prostrated before the Lord.

Lord received Nachiketa Maharaj with a broad smile and took charge of his Gopalji and handed over to a Mother The day next there was a musical programme and many eminent musicians were invited to participate in the programme. Entry to that function was restricted by sale of tickets. And the sale collection was proposed to be donated to the National Defence Fund,

Lord's Gopal had already purchased ticket and the first ticket was purchased by Him. Lord also offered the tickets to Nachiketasananda for his Gopal. Nachiketasananda hesitated and said, 'Thakur, Gopal is everything and it is all His Lila. Why should He purchase the ticket like any ordinary person."

Lord :— But when you love Gopal like your own child and carry Him along with you whereever you go, and feed Him, give Him the bath and enjoy His play as your own child, then He is just a child in flesh to you and you have to spend money, do so many things for Him as a father does. But if you mix this sweet Vatsalya Bhava with the Aishvarya Bhava of Gopal, as He was in the battle-field of Kurukshetra, then you are likely to loose the Vatsalya Bhava.

Once a true Bhakta developed a true Vatsalya Bhava for Prabhuji and used to have His darshans as a child. He used to feed Him, bathe Him and play with Him as his own real child. One day something happened and the Bhakta developed the same confusion and started thinking that Gopal verily is the over Lord of the universe and is omnipotent, omniscient and omnipresent, so He could not be treated as an ordinary child in flesh. The moment this confusion arose the Bhakta lost his Vatsalya Bhava and could no more see and have Gopal's darshans. Aftar a long time it was revealed to him that he would not get darshans any more upto the time of his death, but he would get mukti alright.

Nachiketasananda kept silent, but was still not prepared to purchase the ticket for his Gopal. No body could or ever can understand His Lila.

Lord then suddenly changed the subject and put a question.

Lord ;— The paintings of some of the world's renowned artists, who died years ago, are now sold and resold for lacs of rupees each. Who has put this value ? The artist when he painted the picture did not know that it could fetch lacs of rupees. Naturally you would like to say that it is the society who is the judge and has put such a fabulous price to it. But who has created this society. It is the God who has created the society. Just when an artist wants to paint a picture, he first imagines it and then he puts his best in painting the picture, he looks at it again and again and then gives it the final finishing touches. After that he sits in his chair comfortably and keeps on looking at the painting with the feeling of satisfaction, enjoyment and amusement. Then he says "Yes,

it is the final, I can't do anything more to make it look better." So the value of the painting lies in the eyes of the painter. Similarly, God after having created this world looks at His own Lila and enjoys it. The real value of the beauty of this universe and its objects therefore lies in the eyes of God.

It was already past 11 P.M and Sandhi Puja was to start at 11-37 P.M. Most of the devotees prostrated before the Lord and left. Front doors of the Temple were closed. All the devotees assembled at the Mandap and Shejokaka (Lord's younger brother) was giving a tiny cut with a blade on the chest of all the devotees. Each of the devotees collected a few drops of blood on the Bel-Patra and all such blood-stained leaves were kept in a basket, which would be later offered to the sacrificing fire, i. e. Havan performed at the time of Sandhi Puja.

It was now 11-30 P.M. Kaka and Kavirajji entered the Temple and Sandhi Puja started at 11-37 P. M. and ended at 12-30 A. M. The Aarati Pradip of 103 flames was now lit. Temple doors were closed with most of the devotees inside the Temple. Subash Maharaj was waving that big Pradip before the deity. Lord led the Aarati Kirtan for a few minutes.

Lord with all the devotees now came out in the open. It was past 1 A. M. Lord handed over a sword to Swami Umanand and kept one in His own hand. They had a mock sword fight. Swami Umananda then displayed the sword-play single-handed. Swami Shivananda and Gopal also played on sword. It was 1-30 A. M. All the devotees prostrated before the Lord and dispersed.

2. 12. 65.

Navami Puja.

As usual the Temple was opened at 7 A. M. Lord was seated on His Asan. All the devotees prostrated before Him. Lord recited the holy *Mantras* followed by the devotees. Lord then performed the Yogic Asan. Kathamrita was then read by Swami Nirvedanandaji Aarati commenced and continued upto 8 A. M.

Kaka had already come. Kavirajji and Kaka entered the Temple and Puja was started. Chandi was recited by some of the Sanyasi and Brahamachari devotees. Puja ended at about 11 A. M. Flowers (Anjali) were then offered by the devotees at the lotus feet of the Divine mother.

The devotee prostrated before the Lord and left for taking prasad. At about 1-30 P. M. Lord again entered the Temple along with the Mothers and Chandi (some part of it) was recited with the front doors remaining closed. After recitation of Chandi by Mothers front doors were opened. All the devotees prostrated before the Lord. Sri Subodh Chandra Bannerji and 'R' discussed with the Lord about the Glass Temple under construction at Baranagar Ashram. After the discussion which continued for about an hour, Lord retired to the inner chamber.

Evening :

Music programme was to commence at 9 P.M. Many music artists both male and female have come from Calcutta. Lord therefore came to the Temple to-day earlier. All

the artists one after another came and prostrated before the Lord. He blessed each one of them by touching their head. One of the artists placed before the Lord some of his personal problems. Lord satisfied him by His personal influence and also by analysing his inner nature and placing His analytical observations before the artist in most a affectionate and loving manner. Some of the female artists who were sitting inside the Temple sang a few songs composed by the Lord.

Most of the devotees prostrated before the Lord and left to enjoy the music programme which had already commenced. Lord also came to Mandap with Gopalji and Mothers to enjoy the Music programme.

3. 12. 65.

Dashami Puja.

It was the last day of the Puja.

After usual morning programme the Puja started at 8 A. M. Kaka performed the Puja and Kavirajji conducted the same. There was no recitation of Chandi to-day.

After Puja was over Lord sprinkled the holy Shanti-jaal on all the devotees. Since the Puja was now over many of the devotees who had come from Calcutta and other outstations had to leave of course after having prasad. Lord gave each one of them Bhasma packets and Shanti Jaal for other members of their families and bid them adieu. Jai Thakur.

Ful Jhare Jaye Tabu Gaan Jhare Naa

Sree Thakur

Flowers wither
Songs do never
How blue the sky
Tells not moon shy.
Twilight, so many its hues
Streaming but never lose
Flows on and on
Never out never gone

Burns the weeping incense
Lamp its mate
Stony heart hardness
Why not melt ?
Water of Gomati blue
Wavy runs in glee
God hard as stone
In meditation ever He.

[Translated by S. N. Sanyal]

Whither Our Students : Wherein The Remedy

Principal K. C. Karmakar

"Wisdom belongeth to reverence" (श्रद्धावान् लभते ज्ञानम्।) is a time-honoured saying of the wise in the context of our education It throws interesting sidelights upon the original character of an Indian Scholar, his love of learning, sense of decency, respect for the superiors as well as taste for higher values.

According to Sri Sankara, a disciple is the embodiment of modesty and devotion. He seeks the protection of his preceptor or "Guru". His creative energies ate released into fruitful channels through the spiritual guidance of his teacher. All this conjures up the ideal atmosphere under the Gurukul system. The school was then regarded as a second home, and the teacher and the taught were linked with the silken cord of love and affection.

But with the decadence of the enduring ideals there is an obvious downfall in the character of our students. They are no longer the devoted and modest disciples of the past. Their eyes no longer reflect the purity of heaven. Their voice hardly echoes the melody of the holy sermons In fact, they have foregone the light and culture of India. They stand perverted and frustrated wrought up into the complexity of the modern life. They are used as pawns in the political game. They run helter skelter ; they shout slogans ; they defy the authorities and pollute the sanctity of the temples of learning.

In the present context, sobriety can hardly be expected of our pupils. They do not hesitate to bandy words with their teachers. They undergo strike on flimsy grounds. They adopt unfair means in the Examn. halls often on the point of dagger. They gherao the Principals and Vice-chancellors. They disfigure the walls of their institutions with nasty words. They have grown most insolent and turbulent. They are the malcontents of our society, most dejected and forlorn. Alas ! they have lost the robust optimism of the past, and are lost in the mist of disbelief and ill will, hatred and anger.

Underlying Causes.

The above is, no doubt, a sombre phenomenon, a gloomy vision of our youth. Indeed student unrest is the greatest headache of our education. The main causes may be enumerated as follows :—

Laxity in educational administration ; lost leadership of the teacher ; failure to engage the youthful energy in healthy activities ; absence of religious and moral instruction from the curricula ; a defective system of education ; baneful influence of active politicians ; uncertainty about the future ; general loss of idealism etc.

Remedy :—

The situation can hardly improve through a violent approach to the problem but it needs a most psychological handling. For example, when the students launch an agitation, the wise administrator does not adopt any aggressive measure, but seeks to pacify them through an appeal to their sentiment, so far as possible. Indeed it is the lack of understanding between the teachers and the taught that leads to chaos and confusion. This is all the more intensified, when coupled with the baneful politics of the day. Hence

it is necessary to create a climate of good will and understanding to counteract the cold war sensibility eclipsing the splendour of our education. But this is scarcely feasible unless the teachers are possessed of love, sympathy and imagination. It is only the creative teachers who can elevate the degenerate youth through their more enlightened and far more receptive modes of teaching. They alone can quicken the young minds and inspire the nation with the fire of a new life. The imaginative processes of teaching through which educators like Comenius and Tagore performed wonders, are worth mention in this connection.

Besides, an effort should be made to arouse a sense of values among the students through the revival of our original culture and harmonising this with the recent scientific and technological developments. But this ambition can hardly be translated into reality unless the teachers are morally equipped to fight the ills of life. The guardians should also come forward to face the situation with a reformative zeal. In case their wards are misled to tarnish the image of the institution, they should not escape to an ivory tower. There is no denying the fact that the edifice of education can be built only on the hard rock of unity among the teachers, the students and the guardians, as the school and community are interlinked.

It is high time, a concerted effort was made to inspire the nation at large with lofty idealism so that our students may maintain a higher standard of discipline. What we need to-day is "a clear focus, deeper understanding, collective discipline, hard and sustained work and dedicated leadership". The 'man-making' device as suggested by Swami Vivekananda, needs a proper appliance through the improved technique of our educational system.

Swami Abhedananda Speaks

K. Ghosh, B L.

Once Father O'niel spoke in ruthless tone—
God ne'er hails in lifeless stone :
He reins in church and from pulpit says—
Idol-worship—never it pays.
A young lad hastily talked—Nay, there's life in hill,
Everywhere, the Bible says. He dwells still.
His blessing from rock like nectar falls.
Holy saints find it. only in stony dolls.
When the hoary priest shouts him down,
The boy questioned—why then honour cross and gown ?
These are but knotty matter, you need not bother same
Swami Abhedanand answered well—God pervades every name.

ভাবমুখে

অষ্টবিংশ বর্ষ

বর্ণানুক্রমিক বর্ষ-সূচী—১৩৮১

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
	অ	
অচেতনের চেতন	শ্রীঅর্চনাপুরী	৪২৪
অদ্বৈতবোধের সুর	জয়শ্রী চক্রবর্তী	৩৩১
অন্তরে খুঁজে ফিরি	মায়া দত্ত	১৬৫
অন্নদা ও মা অন্নপূর্ণা	শ্রীশ্যামরতন রায়	২১৯
অনন্ত মিলন	শ্রীমতী দেবীপ্রিয়া দেবী	১১৩
অনন্ত সাহিত্যিক মূলিয়ানা	প্রাক্—ডঃ জয়ন্ত গোস্বামী	১৫৮
অন্বেষণ	শ্রীসুনীলসুধার ভট্টাচার্য্য	৪১৩
অন্তর জয়ন্তীতে	শ্রীঅর্চনাপুরী	১৪২
অন্তর স্মৃতিচারণ	স্বামী হীরানন্দ	২৭৮, ২৯৫
অন্তরানন্দ	শ্রীবীরেন গুহঠাকুরতা	২৫৪
অলৌকিক	শ্রীমচিকেতা জয়ন্ত	২১৫
	আ	
আকাশের রঙমহলে	শক্তিপদ কুইলা	৮৩
আগমনী	শ্রীশ্রীঠাকুর	১৬১
আত্মজ্যোতি	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	৩৭
আত্মসমর্পণ স্তুতি	উমানন্দ	২৪০
আবর্তন	শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ	১২২
আবার বাজলো পূজার শঙ্খ	যোগমায়াপুরী	২০৬
আবার	শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত	২০৩
আমাদের ঠাকুরের জন্মোৎসব	স্বামী মৃগানন্দ	৫৪৪
আমাদের শিক্ষার অবস্থা	শ্রীসুদর্শন বিশ্বাস	২৩০
আমার প্রভু সবার প্রভু সবার মাঝে রয়	শ্রীদেবীপ্রসাদ মহারাজ	
আমি আর জিনয়নী এক	শ্রীসুবোধবন্ধুধার বন্দ্যোপাধ্যায়	২৪৫
আলো না অন্ধকার?	শ্রীঅর্চনাপুরী	৩৫২
আশীর্বাদ	শ্রীমতী কল্পনা ঘোষ	১১
আশ্রম সংবাদ	১৫, ২৫০, ২৮৪, ৩০৪	
আশ্রমের কথা	ও উমা রায়	২৪৭
আশ্বিনের আশ্বিনায়	শ্রীকরা বসু	২৫৫
আসন্ন আষাঢ়	শ্রীঅর্চনাপুরী	৭২
	উ	
উত্তরণ	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	১৬৮
উপল ভাঙা	স্বামী মৃগানন্দ	২৬১
	এ	
একটি জীবন একটি সমাধি	শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত	৪৪১
একটি স্মরণীয় দুপুর	শ্রীঅর্চনাপুরী	৩৬
একটি স্নিগ্ধ প্রভাত	স্বামী মৃগানন্দ	৪০১
এ চাওয়ার কবে হবে শেষ	শান্তিদেবী	৩০৫
এস বুকে ভিড়ে	শ্রীশ্রীঠাকুর	৭১
এসো স্বপ্রকাশ	শ্রীগোপালদাস কাব্যতীর্থতী	১০৫
	ক	
কথামৃত ও বহুমন্ত্রিক	জ্যোতির্ময়ী দেবী	১৫৬
কবি ও কর্মী	শ্রীঅনন্তকুমার সেন	২২৫
কবিঃ পুরাণম্	শ্রীঅর্চনাপুরী	১, ১১৮, ২৮৭, ২৯৭, ৩৯১

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
কালীর প্রসাদ	শ্রীশ্রীঠাকুর	১৪১
কিংবদন্তীর ধারা	শ্রীঅজিতকুমার মিত্র	১৬
কুসুম স্মরণে	কিশোরীরঞ্জন দাশ	৩৪
কে তুমি !	শান্তশীল দাস	৩১৪
কৃপাময় শ্রীশ্রীঠাকুর সত্যানন্দ	উত্তর ভারতী গোস্বামী	
কৃপার পরশ	শ্রীমতী কাজল নন্দী	
গ		
গাইব মা বীররসে ভাসি	শ্রীবিশ্বনাথ বিশ্বাস	৩৫৩
গান রচনা—	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী	
সুর ও স্বরলিপি—	শ্রীপ্রবীর মজুমদার	৪০৫
গান	শ্রীশরণাপুরী	১৪৭
গান	শ্রীশ্রীঠাকুর	২৮৭, ৩৮৫, ৪২৩
গান্ধীজীর শিল্পরসবোধ	শ্রীনিবারণ চক্রবর্তী	১২৮
গীতার বাণী	সাধনাপুরী	১৪, ৮৯, ১১৭, ২৬৭, ৩৭৫, ৪২৫
গোপালের মা	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী	২৫২, ২৮৮
গ্রন্থ পরিচয়	সুনীলকান্তি মুখোপাধ্যায়	১৪০
জ		
জননী সারদা পদাশ্রিত নীলকান্ত	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ	৪১১
জননী সারদামণি	শান্তশীল দাস	৩৪২
জন্মদিনে	শ্রীশরণাপুরী	৪২৮
জয়তু অভেদানন্দ	শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ	১৫৮
জিজ্ঞাসা	স্বামী নির্বেদানন্দ	৩০২
জিজ্ঞাসা—আত্মার মুক্তি	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী	২
জিজ্ঞাসা : মানবী না ঈশ্বরী		৩১৮
ঠ		
ঠাকুর ও মা	শ্রীধীরেন গুহঠাকুরতা	১৫৬
ত		
Don't forget your Lineage	মহামায়াপুরী	
ত		
তথাগত এল নামি	শ্রীশ্রীঠাকুর	৩৫
তানসেনের পরীক্ষা	কমলেশ ঘোষ	১০৪
তিনি ছিলেন তিনি আছেন এবং তিনি থাকবেন	স্বামী শক্ত্যানন্দ	১৩৩
তুমি আছ	শ্রীশান্তশীল দাশ	১০৩
তুমি যারে রাখো	শ্রীশ্রীতিদা মিত্র	৩৩৩
তেরী ছাদ আয়ে	স্বামী মৃগানন্দ	৩৫৭
তোমার গান গাইতে আমায় দিয়ো	শ্রীসুনীল ভট্টাচার্য্য	১৩৬
তোমার হৃদয় বিশ্ব মেউল	স্বামী বোধানন্দ	১৯১
তোর কলসে ডুবে মরে রাই	স্বপনবুড়ো	২১৬
তৃণাদপি সুনীচেন	শ্রীঅসিত বিশ্বাস	১৬০
দ		
দয়া কর দীননাথ হে	শ্রীমহাদেব চ্যাটার্জী	
দিব্যাবির্ভাব	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত	
দুবরাজপুর শ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে শ্রীশ্রীসারদা কাত্যায়নী পূজা ও অভেদানন্দ মেলা		
ধ		
ধন্য আমি	মিনতি ঘোষ	৩৬২
ন		
নমো নম	স্বামী বোধানন্দ	৪৭, ১৪৮
নমো নম	শ্রীশ্রীঠাকুর	২৫১
নাম মাহাত্ম্য	শ্রীদিলীপকুমার রায়	৩২১
নিবেদন	শ্রীঅসিত বিশ্বাস	২৪৬
নিভবে কবে হে দেবতা	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী	১০৬
নেতাজী স্মরণে	শ্রীশশাঙ্কশেখর চক্রবর্তী	৩৬১
প		
পথিক	ব্রঃ সমীর চৈতন্য	৩৬০
পথের আনন্দ বেগে	বরা বসু	৫৪, ৭৮
পরকীয়	শ্রীঅসিত বিশ্বাস	৩৪৭
পরম আশীর্ব্বাদ	শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী	২০০
পরম পুরুষ	শিশির গুহ	২১৬
পরলোক ও পুনর্জন্ম প্রসঙ্গে	স্বামী অভেদানন্দ	স্বামী শিবানন্দ

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
পূর্বাভাসের প্রত্যক্ষ প্রমাণ	আশোক প্রামেরপুখরাজ পাল	৩০১, ৩২১, ৩৭০, ৪১৫, ৪৭৫
পুস্তক সমালোচনা	স্বামী বীরেশ্বরানন্দ	৪
পুণ্য তীর্থ সংঘের পথে—শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যভারতী		
প্রণাম তাঁহার পদতলে	শ্রীজ্যোৎস্না মল্লিক	
প্রকাশ	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক	
প্রথম দিন	শ্রীশরণাপুরী	
প্রণাম	শ্রীঠাকুর	
প্রতি সাধনার গোড়ার কথা	শ্রীনৃসিংহ রামানুজদাস	
প্রলয় জীবন	শাহাবুদ্দীন দাশ	
প্রাচীন ভারতে পরমাণু চিন্তা	শ্রীরাধাবল্লভ আচার্য	
প্রাথমিক শিক্ষা বাড়ো বাড়ো—দুর্গাপদ সিংহ		
প্রার্থনা	ডঃ গোপাল চৈতন্য	
প্রেমের ঠাকুর সত্যানন্দ	শ্রীঅর্চনাপুরী	
ব		
বর্তমান যুগ সমস্যা	সম্পাদকীয়	২৮৩
বহ্যুৎসব	শ্রীজ্যোৎস্নানাথ মল্লিক	২১২
বাণীবন্দনা	শ্রীশরণাপুরী	৩৬৪
বারে বারে তোমায় প্রণমি হে—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস		১২০
বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম—ব্রজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়		৪২
বাহির ডাকে না অন্তরের ডাক—স্বামী ভদ্রেশ্বরানন্দ		২২৭
৺বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ স্মরণে—দীনেন্দ্র মুখোপাধ্যায়		২৮
বিবেক বীরেশ্বর	শ্রীঠাকুর	৩০১
বিরহে বিচ্ছেদে	শ্রীসুবেন্দু মল্লিক	২৪৪
বিশে শ্রাবণ আর বাইশে শ্রাবণ—স্বামী বোধানন্দ		১০৭
বিশ্বজননী	শ্রীবীরেন গুহঠাকুরতা	৩৪২
বিশ্বজননী	শ্রীশরণাপুরী	১৮৯
বীরভূম জেলার আলীপতে শ্রীঠাকুর সত্যানন্দ মেলা ও প্রদর্শনী		৩১৪
বুদ্ধিতে যার ব্যাখ্যা নাই	শ্রীরাজেন্দ্রনাথ পণ্ডিত	২৩৪
বেদ ও অবেদ্য	পূরবী পাল	৩০, ৫৭, ৮৩, ১২৯, ২৫৬, ৩৭২, ৪৩৮
বৈষ্ণব রীতি কবিতা	স্বামী মহানন্দ	৪
বাধাহারী	শ্রীমতী বন্দনা দাস	৪২২
ভ		
ভক্ত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল	শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	১৭৫
ভক্ত বীরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের রামকৃষ্ণলোকে প্রয়াণে		২৮২
ভাগাবান বৃক্ষ (২২)	শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ	১৬৬
ভারতীয় সঙ্গীত প্রসঙ্গে	শ্রীঅমলেশ মিত্র	৩৮১
ভারতে স্বামী অভেদানন্দ—শ্রীকেশবচন্দ্র ঘোষ		৪৮
ম		
মধ্যশিক্ষার রূপান্তর	অনুলিখন : স্বামী বীরানন্দ	৩৩৪
মহানিধন	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	৪১১
মা	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত	১৫৫
মাইকেল স্মরণে	শ্রীসুধীরকুমার রায়	৩৫১
মা জগদম্বা স্মরণে	মহামায়াপুরী	৩৪৩
মাগী কৃষ্ণ দ্বিতীয়ার তোমাকে প্রণাম	শ্রীকণপ্রভা ভাদুড়ী	৩১৬
মাতৃ-আগমনে	শ্রীমোহিনীমোহন গাঙ্গুলী	২০৪
মাতৃ-বন্দনা	কল্পনা ঘোষ	৩৩৮
মাতৃ-বন্দনা	শ্রীপার্থসারথি ঘোষ	২২৯
মাতৃ-স্তোত্রম্	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত	১৯৭
মাণিকজোড়ার কুলি	স্বামী মৃগানন্দ	১৯৫
মানে না মন কোনো মানা—শ্রীজীবনকৃষ্ণ দাস		৩৩৩
মিনতি	শান্তি দেবী	৩৯৮
মেদের প্রাণের ঠাকুর	শ্রীসুবোধগোপাল মুখোপাধ্যায়	
মৃত্যুকালের ভাবনা অভ্যাস বিষয়েই হয় —শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার		
য		
যুগে যুগে	শরণাপুরী	
র		
রক্ত কমল হার মেনেছে	শ্রীমতী বন্দনা দাস	৪১
রক্ষণপ্রিয়তা	স্বামী বিশ্বরূপানন্দ	৫৭১, ৫১১, ৩৩৭, ৩৪৮, ৩৫৯
রঙ্গরাজ হুমায়ুন	শ্রীইন্দুভূষণ গুপ্ত	৪১৭, ৪২৯

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
রসো বৈ সঃ	শ্রীরতি	৪০, ১৪৯, ২৯০, ৩৯০
রাজর্ষি জনক এবং ঋষি শুকদেব —শ্রীসুরেশচন্দ্র নাথ মজুমদার		
রাত্রি স্তুতি	শ্রীঅর্চ্চনাপুরী	
রূপসী তিস্তার তীর ধরে	মীরা রায়	
রূপান্তর	সন্ন্যাসিনী আশাপুরী	
ল		
লহ প্রণাম শ্রীরামকৃষ্ণ	স্বামী অরূপানন্দ	
লীলাকে ঠাকুর	স্বামী মৃগানন্দ	
লীলা যে অনুরাগ	সাধনাপুরী	
শ		
শরণাগতি	শ্রীমতী করুনা ঘোষ	৪১৪
শরৎ রাণী	সুনন্দা সিংহ	২৪১
শান্তিব্রতা মা সারদা	ক্ষণপ্রভা ভাদুড়ী	৩৮০
শারদ-মন	শ্রীরমেন্দ্রনাথ মল্লিক	২১১,
শিল্পী পৃথিবী	শ্রীসুনীলকুমার ভট্টাচার্য্য	১৬৮
শুধু একটি প্রণাম	কবিরঞ্জন হেমন্তকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	২১৫
শুনুন, শুনুন, গোপন কথা বলছি—শ্রীকিরণ সিংহ		২৫৮, ৩০৬, ৩৩১, ৩৬৬, ৪০৩, ৪৩২
শেষ দর্শন	অধ্যাপক প্রবোধেন্দু প্রসাদ পাল	১২১
শ্যামপুকুরে শ্রীরামকৃষ্ণ	শ্রীরমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য	১১১
শ্রাবণ	শ্রীশ্রীঠাকুর	১০৫
শ্রীগুরু স্মরণে	পূরবী পাল	২৪৯
শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দ প্রসঙ্গে—শ্রীদিলীপকুমার রায়		১৭১
শ্রীমৎ প্রত্যগাত্মানন্দায়	ঐ	১৪৬
শ্রীমৎ সায়নাচার্য্যকৃত ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা ভাহার অবয়, টীকা ও বঙ্গানুবাদ —স্বামী নচিকেতসানন্দ		৩৮
শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের স্মরণে —স্বামী ওঙ্কারেশ্বরানন্দ		
শ্রীমৎ স্বামী সত্যানন্দ	শ্রীগোপাল মণ্ডল	
শ্রীমায়ের একটী বাণী	স্বামী মৃগানন্দ	

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
শ্রীরামকৃষ্ণ লীলা ও কথামৃতী—৺মনীন্দ্র সাহা		৬৩
শ্রীশ্রীকেদারনাথ তীর্থ দর্শন—শ্রীসুরেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়		৬, ২৭৮, ২৯৯, ৩৬৯, ৩৯৭
শ্রীশ্রীঠাকুর স্মরণে—কবিরাজ রামাধ্যাপ্রসাদ সেনগুপ্ত		১১০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বন্দনা—শ্রীনীহারবালা বন্দ্যোপাধ্যায়		২৬৩
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবায়তনে মাসব্যাপী নামযজ্ঞ		৬৬
শ্রীশ্রীরামলাল দাদার প্রসঙ্গ ও পত্র—শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ		৯৩
শ্রীশ্রীসত্যানন্দ নামমহিমা—ডঃ শ্যামল চৈতন্য		২৮
স		
সত্যানন্দ আহ্বান	চন্দ্রশেখর ঘোষ	৬১
সত্যানন্দ বন্দনা	শ্রীবাসুদেব সিংহ	৩১৫
সত্যানন্দ বাণী আলোচনা	স্বামী নির্বেদানন্দ	২১
সত্যানন্দ রক্ষ মাম্	স্বামী মৃগানন্দ	১২৩, ১৫২
সত্যানন্দ লীলাতীর্থ	যোগলাপুরী	৪০
সত্যানন্দ স্তুতি	শ্রীনারায়ণ	১৩৬
সন্ন্যাসিনী আশাপুরী মা	স্বামী অরূপানন্দ	৩১৫
সন্ন্যাসিনী অপর্ণালাপুরী মাতার মহাপ্রয়াণে—		৩৪৬
সর্বভূতেষু	শ্রীশ্রীতিশ মিত্র	৪১২
সম্পাদকের কথা	স্বামী হীরানন্দ	২৯
সৎসঙ্গ	স্বামী হীরানন্দ	২৪১
সারদা মা গৌরী	শ্রীশ্রীঠাকুর	৩১৭
সারদা বন্দনা	শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র গুপ্ত	৩৩৮
সারদা সরস্বতী	সাধনাপুরী	৪২২
সাহিত্যে অনধিকার চর্চা	শ্রীনিখিল রঞ্জন রায়	১৮৪
সিউড়ী শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ আশ্রমে জগদ্ধাত্রী শ্রীশ্রীসারদাদেবীর শুভ জন্মোৎসব		
স্বপ্ন যখন সত্য হয়	স্বামী ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী	৩২
স্বল্প সঞ্চয়ের উপযোগিতা—স্বামী নীলানন্দ		৩৩২
স্বাতী নক্ষত্রের জল (নাটক)—শ্রীঅর্চ্চনাপুরী		৪১৭
স্বামিজী	স্বামী বোধানন্দ	২১
স্বামী প্রেমানন্দের নাটশাল দর্শন—শ্রীসতীশচন্দ্র নাথ		১১৯
স্বামী শিবানন্দ	স্বামী হীরানন্দ	৪৪২
স্বামী সত্যানন্দের কবিতায় প্রকৃতি চেতনা ও রূপকল্প—শ্রীব্রজনারায়ণ মুখোপাধ্যায়		

বিষয়	লেখক লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
স্মৃতির একটি অঞ্জলি	বন্দ্যতরু ঘোষ	৪০৩
স্মৃতির পাতা	শ্রীপাল	
স্মৃতির পাতায়	অরুণা মুখোপাধ্যায়	

বিষয়	লেখক-লেখিকা	পৃষ্ঠাঙ্ক
হঠাৎ মাঝে মাঝে	শান্তশীল দাশ	
হরি সচ্চিদানন্দ	শ্রীমহাদেব চট্টোপাধ্যায়	
হরের্নামৈব কেবলম্	শ্রীঅসিত বিশ্বাস	
হে মোর দেবতা লহ প্রণাম—শ্রীশচীন্দ্রনাথ সান্যাল		

English

Subject & Author's name	Page
A	
Aldous Huxley and Indian Philosophy—Dr Subhas Sarkar	25
All in All—Sri Dilip Kumar Roy	73
C	
Certitude—Sri Dilip Kumar Roy	66
F	
Ful Jhare Jaye Tabu Gaan Jhare Naa—Sree Thakur, Translated by S. N. Sanyal	60
G	
Ghoom Esechhe Pra[illegible]bhe—Translated by S. N. Sanyal	[illegible]
H	
Have you seen—Sree Satyanan[illegible]va	27
L	
Lukiye Kothay Thakis Go Ma—Sree Thakur, Translated by S. N. Sanyal	
O	
Oh Thou Prayest—Sm. Rina Mitra	73
P	
Patience—Buddhadev Chatterjee	41
Play and Child Growth—Prasad	31
Pratham Dinei Ma Bolechi Bhulash Ne Ma Sesher Dine—Translated by S. N. Sanyal	72

Subject & Author's name	
S	
Some Interesting Aspects of Abhedananda Philosophy—Swami Bimalananda	13, 21
Spiritual Talks—From R. L. Goel's Diary	30, 34, 58, 61, 71, 77
Srabana-Mangalam—Sadhana Puri, Translated by S. N. Sanyal	32. 40, 49, 53
Sri Sri Dhani-'Ma', the spiritual Illuminator of Sri Sri Ramkrishna—Principal K. C. Karmakar	28
Swami Abhedananda speaks—K. Ghosh, B. L.	82
T	
The Frontier Gandhi—Principal K. C. Karmakar	
The Gurudev—V. Ganesh Rav	
The Invisible Hand—Sri P. S. Rao	
The mysteries and glories of Lord Venkateswara at Tirupati—V. Ganesh Rav	37, 47, 55, 63, 69
W	
Whither our Students : Wherein the Remedy—Principal K. C. Karmakar	81
Wordsworth's Mysticism : A Reinterpretation—Shailendra Nath Chakravarty	5, 11, 19
World Psychology—Sreemat Swami Satyananda Deva	1, 9, 17, 23, 31, 35, 43, 51, 59, 67, 75

'SAFEX' LAMINATED SAFETY GLASS

TOUGHENED GLASS

"TWINBIRD" MIRRORS ETC.

Manufactured by :—

Hindusthan Safety Glass Works Private Ltd.

2, ST. GEORGE GATE ROAD, HASTINGS,

CALCUTTA-22

Gram "DEVGLASS" PHONE : 45-0125 (5 Lines)

WORLD PHILOSOPHY

by

Swami Satyananda

Part—I, II, III

Price Rs.—9/-, 9/- & 7·50

According to Dr. Satkari Mookherjee, M A., Ph. D.

It is a synthetic study on the problems of almost all systems of Philosophy—Eastern and Western, ancient and modern. The book bears the stamp of industry, erudition and scholarship, is well documented and is a valuable addition to the field of knowledge.

প্রচ্ছদপট পরিচিতি :—ফরাসী শিল্পী J. B Corot-এর আঁকা একটী ফরাসী গ্রামের শান্তছায়ানীল landscape. এঁর কথা—তোমার প্রথম অনুভূতিকে প্রকাশ কর, তাহ'লে সাধারণ মনে সাড়া জাগবে। শ্রীমা যেমন বলতেন—মনের প্রথম কথা শুনতে হয়। যুগ্ম-পত্রিকা সচিব—স্বামী অরুণানন্দ ও স্বামী উমানন্দ। যুগ্ম-সম্পাদক—স্বামী নীলানন্দ ও ডক্টর সমীর ভট্টাচার্য্য। সহ-সম্পাদক—স্বামী হীরানন্দ ও স্বামী মৃগানন্দ। প্রচার সচিব—স্বামী সদানন্দ, স্বামী অক্রেশ্বরানন্দ, স্বামী অমলানন্দ ও ব্রঃ তারক চৈতন্য।

প্রতি সংখ্যা ৭৫ পয়সা

বার্ষিক মূল্য টাঃ ৮·০০

In the Service of the Nation

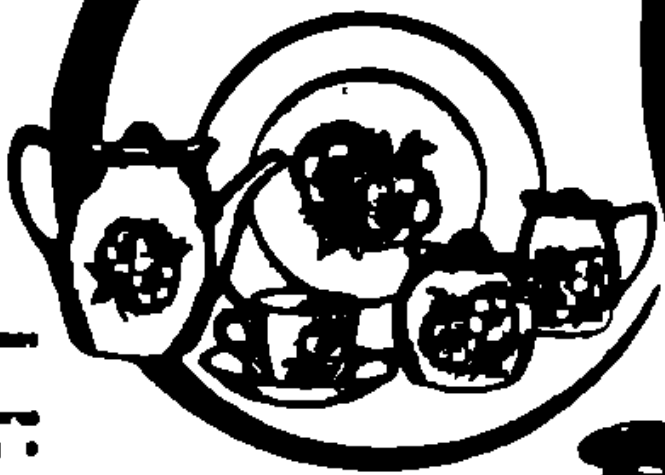

for Hotels & Hostels
Glass Ware
Tea & Tableware
Hand Painting &
Gold Lining

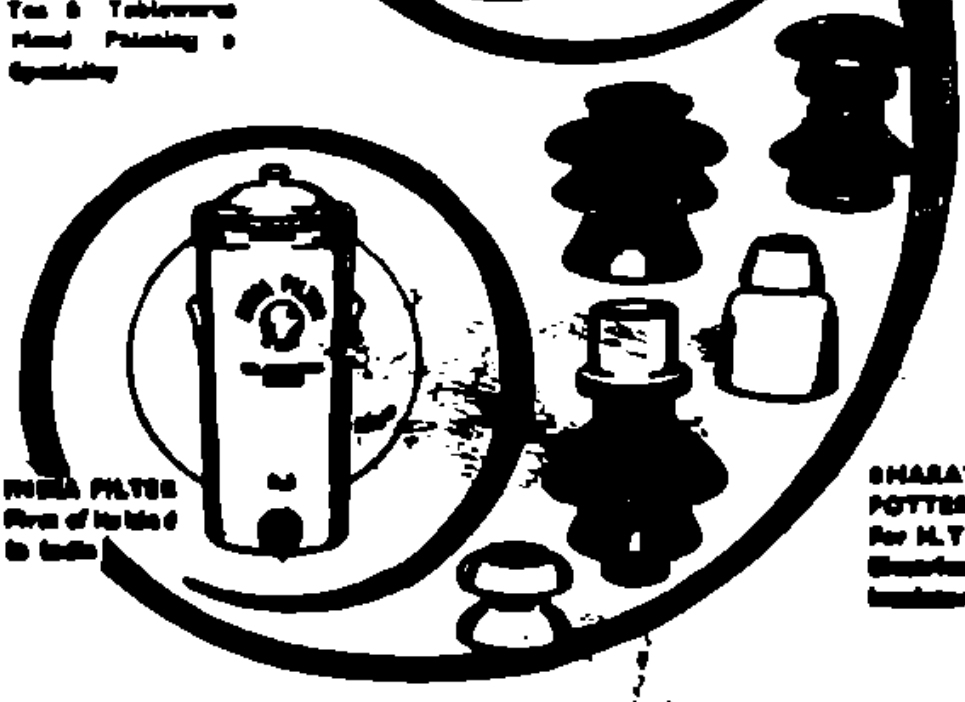

INDIA POTTERIES
Pioneers of the Industry
in India

BHARAT
POTTERIES
For H.T & L.T
Electrical
Insulators

Manufacturers & Exporters

INDIA POTTERIES LIMITED
24, BHARATTALLA STREET, CALCUTTA-13

Sole Selling Agents— COMMERCIAL CONCERN, 17, Old Chinabazar Street, Calcutta 1.

শ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রম, ১নং প্রাণকৃষ্ণ দাঁহা লেন, কলিকাতা-৩৬ হইতে প্রকাশিত ও কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিঃ, শিবনারায়ণ দাস লেন, কলিকাতা-৬ হইতে মুদ্রিত (ফোন : ৩৪-২০৮৪)। মুদ্রাকর ও প্রকাশক-স্বামী ঊমানন্দ।